KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২০/১ ২০/২ ২০/৩ ২০/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৫ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৫ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৫ মাঘ - চৈত্র ১৩৬৫
	Condition : Brittle Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চতুরঙ্গ হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

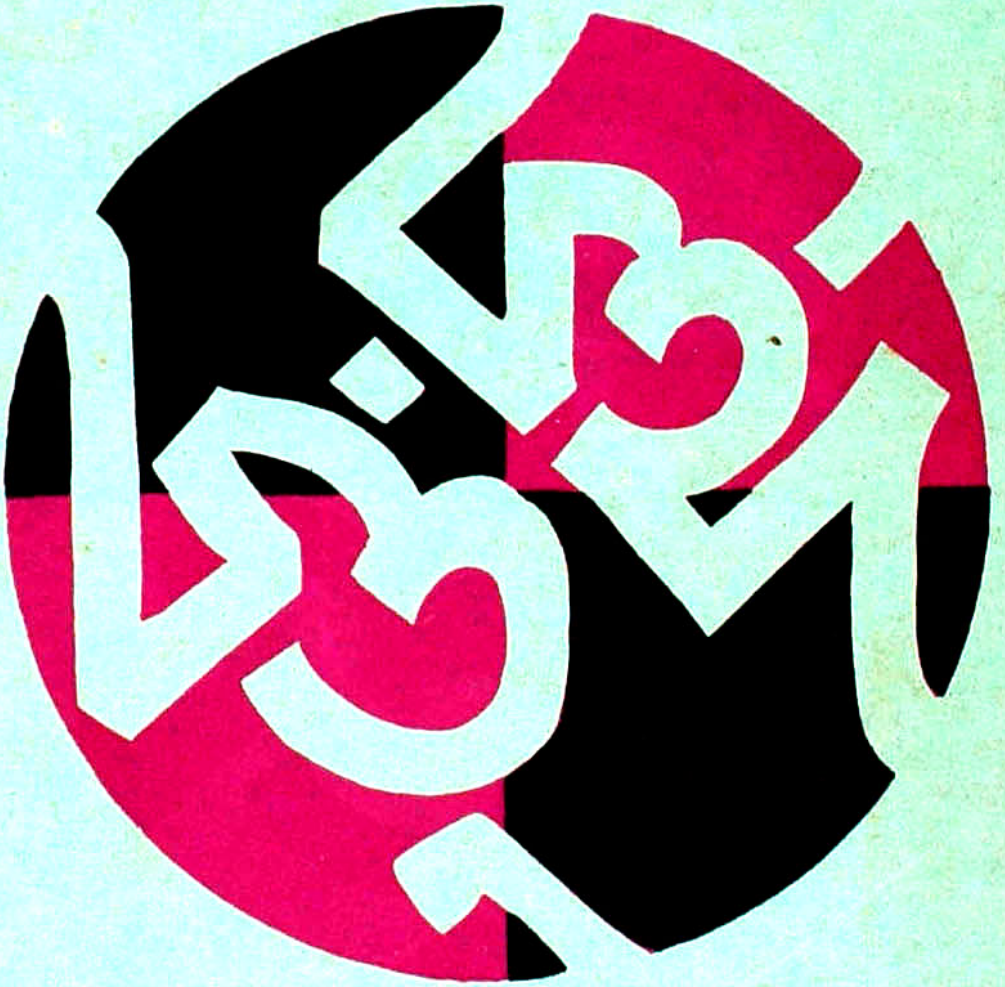

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ১
অরুণ সরকার ॥ নাগর ৭
অরুণ ভট্টাচার্য ॥ পোস্টার ৮
আবুল হোসেন ॥ কাঁদার অপেক্ষা রাখে না ৯
মণীন্দ্র রায় ॥ ক্লান্তি থেকে ১০
অমলেন্দু বসু ॥ সাহিত্য ও বিজ্ঞান ১১
সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ নদ ও কড়ি ২৬
অশোক মিত্র ॥ বুদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ৪৮
অমিয়ভূষণ মজুমদার ॥ রীতিমতো গল্প ৫৬
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ আধুনিক সাহিত্য ৭৪
সমালোচনা—অরুণ মিত্র, নিরুপম চট্টোপাধ্যায়,
জ্যোতির্ময় রায়, উৎপল দত্ত, সন্তোষকুমার দে ৮০

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা   বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

কলেকটীভ ফার্ম বা সমবেতভাবে চাষের ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অংগ বললে অত্যুক্তি হবে না। লেনিনের আমলেও রাষ্ট্র এবং সমাজ বিপ্লবে কৃষকের স্থান নিয়ে মতভেদ ছিল, সন্দেহ ছিল। সাম্যবাদী মতবাদ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিককে প্রগতিশীল ও বিপ্লবপন্থী এবং কৃষককে সংরক্ষণশীল ও বিপ্লব-পরিপন্থী মনে করত। লেনিন সে কথা পুরোপুরি মানেননি, কৃষককেও সেদিনকার রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবে ব্যবহার করেছেন বলেই তাঁর কর্মপন্থা সফল হয়েছিল। লেনিন-পরবর্তী যুগে স্টালিন এবং অন্যান্য রক্ষণশীল সাম্যবাদী নেতার মতকে অগ্রাহ্য করে মাওৎ সে তুং কৃষককে বিপ্লবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যাঁরা ষোল আনা বিশ্বাস করেন, তাঁদের সকলেরই চেষ্টা পুরাতন কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন করে কৃষিকেও বর্তমান যুগের বিরাট শিল্প ও উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে হবে।

কৃষির শিল্পীকরণ হিসাবেই হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজ বা কলেকটীভ ফার্মের সুরু হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা অল্পদিনের মধ্যেই দেখলেন যে এ পরিবর্তনের ফলে বিপুল শক্তিশালী নতুন এক অস্ত্র রাষ্ট্রের হাতে এসেছে। সোভিয়েট-পূর্ব যুগেই রুষদেশে শিল্পবিপ্লব সুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রুষ সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি। বিপ্লবের পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে কিছুদিনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে সোভিয়েট রুষে যখন পঞ্চশালা পরিকল্পনা সুরু হয়, তখন তার ফলে সমস্ত দেশে জনসাধারণের ধন উৎপাদনের শক্তি আবার দ্রুতবেগে বাড়তে সুরু করল। সে বৃদ্ধির অন্তত একটি অংশ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে এ আশা শুধু স্বাভাবিক নয়, প্রায় অনিবার্য। সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতারা নানা কারণে স্থির করেছিলেন যে তা হবে না, বর্তমানকে বঞ্চিত করে ভবিষ্যত গড়বার কাজে নতুন সম্পদের সমস্তটাই ব্যবহৃত হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়, সেখানে যে রাষ্ট্র-সংগঠন, তাতে জনসাধারণের মতামত পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা আজো কঠিন, স্টালিনের যুগে একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে একেবারে

অগ্রাহ্য করাও কোন কালে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুত স্টালিনের আমলে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হয়, তখন কৃষক সমাজের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাতে বাধা দিয়েছে। চাষী বহুক্ষেত্রে চাষ করেনি, ফসল নষ্ট করে দিয়েছে, গরু বাছুর মেরে কেটে খেয়ে ফেলেছে। ফলে সে সময় নগরবাসী শ্রমিকের খাদ্যসংস্থান রাষ্ট্রের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র বিরুদ্ধবাদী চাষীদের কঠিন শাস্তি দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ চাষী সর্বস্বান্ত হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু কেবল শাস্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, তাই সেই শিল্পীকরণের যুগে শহরের কারখানার শ্রমিক যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কলেকটীভ ফার্ম বা কলখজ সেই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবেও সেদিন ব্যবহৃত হয়েছিল।

কলখজের পাশাপাশি বহু কো-অপারেটিভ বা স্বেচ্ছাসমবায় ফার্ম-ও গড়ে উঠেছে। বস্তুত, মনে হল যে বর্তমানে কলখজের চেয়ে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রসারই তাড়াতাড়ি হচ্ছে। কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, কো-অপারেটিভেও তা পুরোপুরি মেলে, সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ ফার্মে স্বাধীনতার খানিকটা অবকাশ আছে বলে কৃষক সমাজ তাকে ততটা অপছন্দ করে না। তবে কলখজই হোক অথবা সমবায় ফার্ম হোক, এ সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে কৃষির শিল্পীকরণ। বহুদিন থেকে মানুষ দেখেছে, যে শিল্প এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে পুরাকালের ছোট ছোট পরিবার-নির্ভর গৃহশিল্প ভেঙে যেদিন কারখানার প্রবর্তন হল, সেদিন এক পক্ষে শিল্পের আয়তন ও উৎপাদন বেড়ে গেল, অন্য পক্ষে যন্ত্রের অধিক ব্যবহারের ফলে শিল্পের গতিবেগ ও বর্ধনশক্তি বহুগুণে প্রসারিত হল। ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লব বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের এই হল গোড়ার কথা। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিল, সমাজের সংগঠন বদলাতে সুরু করল, পুরাতন বিচ্ছিন্ন গৃহনির্ভর গ্রাম্যসভ্যতার বদলে শিল্পনির্ভর এক নতুন বিশ্বব্যাপী নাগরিক সভ্যতার পত্তন হল।

কৃষির ক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বহু মনীষী বহুদিন থেকে ভেবেছেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতকের গোড়ায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের ছোট ছোট ভাঙাচোরা জোতজমিকে একত্র করে আমরা যদি যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা না করি, তবে কোনদিনই এদেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে কৃষির এ প্রসারণের ফলে ব্যক্তিসম্পত্তি লোপের কোন প্রয়োজন নেই। স্বেচ্ছায় যদি চাষীরা সমবেতভাবে চাষের ব্যবস্থা করে, তবে তাতে সমাজের সম্পদ বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সম্পদও বাড়বে। যন্ত্র চাষের অর্থ কেবলমাত্র যন্ত্রের ব্যবহার নয়, বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে জমির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধিই তার লক্ষ্য। পূর্বে একশজন লোক যে পরিমাণ কাপড় সারা বৎসরে বুনতে পারত, আজকাল একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে এক সপ্তাহে তা বুনতে পারে। কৃষির ক্ষেত্রেও আজ তাই চেষ্টা যে সকলের সমবেত চেষ্টায় যন্ত্রের সাহায্যে এমন কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যে একজন লোকের পরিশ্রমে যেন দশজন লোকের সারা বৎসরের খোরাকের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম ইয়োরোপের অনেক দেশ অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তা হয়েছেও। সেখানে শতকরা দশ পনেরোজন লোক যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে, তাতে দেশের সমস্ত লোক পর্যাপ্তভাবে খেয়ে পরেও বিদেশে রপ্তানীর জন্য অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে।

কলখজ ও কো-অপারেটিভ ফার্মের দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রেও সেই উদ্দেশ্য সফল

করতে চায়, কিন্তু এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। বস্তুত, স্টালিন-যুগের রাষ্ট্র-নেতাদের ভুলভ্রান্তির জন্য বরং প্রথম প্রথম সোভিয়েট নাগরিকের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রুষ দেশের জনসাধারণ যে পরিমাণ খোরাক পোষাক পেয়েছে, স্টালিনের আমলে তা পায়নি। স্টালিনের মৃত্যুর পরেই এ বিষয়ে সোভিয়েট কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছে, এবং গত পাঁচ বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতিও করেছে। তবু আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি, আজো বহু প্রয়োজনীয় জিনিস হয় মেলে না, নয় দুর্মূল্য। কাপড় জামা জুতোর কথা ছেড়ে দিলেও জনসাধারণের তরীতরকারী ফলের চাহিদাও আজো সোভিয়েট রাষ্ট্র পুরোপুরি মেটাতে পারে না।

সোভিয়েট দেশে সফরের সময় উজবেকীস্তানে আমি দুটি কলেকটীভ ফার্ম দেখেছিলাম। একটি তাসকন্দের কাছে, অন্যটি সমরকন্দে। তাসকন্দের ফার্মটির নাম কার্ল মার্কস কলখজ, ১৯৩০ সালে তার প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় গোলাম মহম্মদ আবদুল্লা তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৯ সালে আমি যখন সেখানে যাই, তখনো তিনি সভাপতি। শুনলাম যে এভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে একটানা সভাপতিত্ব সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে বোধ হয় আর কেউ করেননি।

কার্ল মার্কস কলখজের আয়তন প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল হবে, দৈর্ঘ্য দশ মাইল, প্রস্থ তিন মাইল। কলখজে সাড়ে পাঁচশো পরিবারের বাস—জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সাবালক নরনারীদের মধ্যে ১০৫০ জন কলখজের সদস্য, বাকী ৩০০ শহরে কাজ করে। সদস্যদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব বাড়ি রয়েছে, যাদের নেই, অন্যান্য সদস্যেরা তাদের বাড়ি তৈরীতে সাহায্য করে, কলখজ থেকেও ঋণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ বাড়িতেই দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর বসবার ঘর আলাদা। টেবিল চেয়ার বা অন্য কোন আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের মতন উজবেকিস্তানেও অধিকাংশ লোক মাদুর বা তোষক বিছিয়ে মাটিতে শোয়, জমিতে বসে খায়।

কার্ল মার্কস কলখজে ব্যাপকভাবে আঙুরের এবং শাক সব্জী তরীতরকারীর চাষ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপালনের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং দুধ মাখন পনিরও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। পূর্বেই বলেছি যে আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ সমস্ত জিনিষের অভাব, কাজেই কলখজের সমস্ত উৎপাদনই অনায়াসে বিক্রী হয়ে যায়। পূর্বে কলখজ বা কো-অপারেটিভ ফার্মের সদস্যদের অভিযোগ ছিল যে বাধ্যতামূলকভাবে শহর বা কারখানায় খোরাক জোগাতে হত, ফলে তারা ফসলের উপযুক্ত দাম অনেক সময়ে পেত না। মিষ্টার ক্রুশ্চভ আজকাল তাদের বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে প্রায় সর্বত্র চাষীর উপার্জন অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে মিষ্টার ক্রুশ্চভের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণও তাই। সদস্যেরা কাজের হিসাবে বেতন পায়। কে কতঘণ্টা কাজ করল তার হিসাব না করে কে কতখানি উৎপাদন করল সেই ভিত্তিতেই মজুরী বাঁটা হয়। কলখজের কমিটি স্থির করে যে একদিনে সুস্থ ও সক্ষম একজন কর্মীর আট ঘণ্টা মেহনতে এতখানি ফল পাওয়া উচিত এবং তার জন্য মজুরী এত রুবল হলে ঠিক হয়। সেই সময়ের মধ্যে যদি কারু উৎপাদন বেশী হয়, সেই অনুসারে তার রুজিও বেড়ে যায়। কলখজের সভাপতি বললেন যে তাঁরা স্থির করেছেন যে উপরে লিখিত মান অনুসারে পুরোদিনের কাজের জন্য বিশ রুবল দেওয়া হবে, এবং সে হিসাব অনুসারে তিনি নিজে গত বৎসর দুই হাজার কর্মদিবসের ভিত্তিতে চল্লিশ

হাজার রুবল উপার্জন করেছেন। তিনি আরো বললেন যে সকলের মজুরী দিয়েও গত বৎসর কলখজটি এক কোটি রুবল মুনাফা করেছে।

প্রথম যখন কলখজগুলি সুরু হয়, তখন ব্যক্তি-সম্পত্তি লোপ করবার চেষ্টাও হয়েছিল। তার ফলে কৃষির উৎপাদন এককালে খুবই কমে যায়। ১৯৩০ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে বার বার বিক্ষোভের কথা শোনা যায়, লক্ষ লক্ষ চাষীর ঘরবাড়ি উৎখাত হয়েছিল, বার বার বহু নাগরিকের নানাভাবে শাস্তি হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও হয়েছে, কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর তার অন্যতম কারণ। সে সময়ের নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যেও কিন্তু জনসাধারণ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করেনি। রাষ্ট্রশক্তি কেবলমাত্র দণ্ডবিধান দিয়ে মানুষকে শান্ত রাখতে পারত না, বর্তমানের দুঃখের মধ্যেও জনসাধারণ ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের স্বপ্ন দেখেছে বলেই তারা এত দুঃখ কষ্ট এ-ভাবে সহ্য করেছে। সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থাও এবিষয়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করেছে। আশৈশব নাগরিক শিখেছে যে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা এবং গৌরবের জন্য দুঃখ স্বীকার এমনকি জীবনদানও নাগরিকের কর্তব্য। তারপরে যখন নাৎসি জার্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করল তখন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় সোভিয়েট নাগরিক অলৌকিক ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে স্টালিনও বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র শক্তির দ্বারা শাসন করা যায় না। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও খানিকটা বদল সুরু হয়। কলখজে সেই সময়ে ব্যক্তি সম্পত্তির স্বীকৃতি দেখা দেয়, এবং ভবিষ্যতে কলখজের বদলে সমবায় চাষের দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে কলখজের প্রায় সমস্ত সদস্যেরই খানিকটা নিজস্ব জমি এবং নিজের গরু বাছুর রয়েছে। জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়, বোধ হয় প্রতি পরিবারের ভাগে আন্দাজ ১৫০০ বর্গ গজ জমি হবে। শুনেছি যে বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত জমির শতকরা ৯৫ ভাগ কলখজ বা সমবায় চাষে ব্যবহৃত, মাত্র শতকরা পাঁচভাগ জমি বিভিন্নভাবে চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তবু ব্যক্তিগত চাষের জমিতেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত ফসলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়। কলখজের কর্তারাও স্বীকার করলেন যে চাষীদের নিজস্ব জমিতে যে ফসল হয়, তাদের বাড়ির গরু ছাগল যে পরিমাণ দুধ দেয়, তা সাধারণত কলখজের উৎপাদনের হারের চেয়ে অনেক বেশী।

যুগোশ্লাভিয়া বা বুলগেরিয়ায় এ কথার স্বীকৃতি আরো বেশী স্পষ্ট। যুগোশ্লাভিয়া সাম্যবাদী দেশ, মার্শাল টিটো এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তবু সাম্যবাদের ব্যতিক্রম ঘটেছে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া মার্কসবাদকে আরো বেশী বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসরণ করে। তা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়ায় চাষের জমির অধিকাংশ চাষীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু চাষের ব্যবস্থা সকলের সম্মিলিতক্রমে সমবায় পদ্ধতিতেই হয়। বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি যে কলখজের চেয়ে সমবায় চাষের প্রতি ঝোঁক ঢের বেশী, এবং একথাও অনস্বীকার্য যে কৃষির ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়া উভয় দেশই সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। শুনলাম যে বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি এক নতুন বিকাশ দেখা দিচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত সমবায় চাষের ব্যবস্থায় চাষী শ্রমিক হিসাবে মজুরী উপার্জন করত এবং সমবায় ক্ষেত্রের আংশিক মালিক হিসাবে জমির খাজনাও পেতো, কিন্তু শুনলাম যে দুয়েক বছর থেকে কোন কোন সমবায় সমিতির সদস্যেরা স্বেচ্ছায় স্থির করেছেন যে তাঁরা মালিকানার ভিত্তিতে

খাজনা নেবেন না, কেবল মজুরী হিসাবে যা পাবেন তাই দিয়ে সংসার চালাবেন। খাজনার অংশ সমিতির তহবিলে জমা হয়ে সকলের সমবেত সম্পদ দিন দিন বাড়াবে।

মানুষ বিপদ-আপদের কথা ভেবেই সম্পত্তি অর্জন করে। ভাবে যদি এমনদিন আসে যে নিজের পরিশ্রমে আর জীবিকানির্বাহ করতে পারবে না, তখন অন্তত সম্পত্তি ভাঙিয়ে দিন চলবে। কাজেই সমাজ-ব্যবস্থা যদি সকলের ভরণ পোষণের ভার নেয়, মানুষের মনে এ আশ্বাস গড়ে উঠে যে রোগে দুর্দিনে বা বৃদ্ধ বয়সে জীবিকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই, তবে সম্পত্তি সঞ্চয়ের আগ্রহও স্বভাবতই কমে আসবে। যা দুর্লভ বা যার প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, তাই মানুষ সঞ্চয় করতে চায়। যা সহজলভ্য এবং নিশ্চিত, তা সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের আগ্রহ কোনদিন কারুরই হয় না। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কল্যাণে সমস্ত মানুষের জন্য সুস্থ স্বচ্ছন্দ এবং সচ্ছল জীবিকার ব্যবস্থা মানুষের করায়ত্ত। কাজেই সম্পত্তিবোধ এবং সঞ্চয়স্পৃহা যদি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে তো আশ্চর্যের কারণ নেই।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজগুলি কেবলমাত্র শস্য উৎপাদনের সংগঠন নয়, তাদের মাধ্যমে সমাজজীবনের রূপান্তরের চেষ্টাও সমান স্পষ্ট। কার্ল মার্কস কলখজে কিণ্ডেরগার্টেন তো রয়েছেই, তাছাড়া তিনটি স্কুল এবং ক্লাব লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও রয়েছে। একজন সদস্য ভারতীয় ফিল্ম দেখে ভারতীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন, ক্লাবের সবাই মিলে আমাদের একটি ভারতীয় রাগিণী বাজিয়ে শোনালেন। কিণ্ডেরগার্টেন থেকে সুরু করে থিয়েটার লাইব্রেরী ক্লাবের মধ্য দিয়ে কলখজগুলি সদস্যদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে খানিকটা শিথিল করে কলখজের সামষ্টিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।

কলখজগুলির পরিচালনার জন্য যে বোর্ড, তার সদস্যসংখ্যা সাধারণত এগারো। কলখজের সমস্ত মেম্বর মিলে দুবছরের জন্য বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করেন, সভাপতিও সমস্ত কলখজের দ্বারা নির্বাচিত হন। হিসাব নিকাশের জন্য অর্থকরী সমিতি রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা পাঁচ। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বোর্ড ও অর্থকরী সমিতির সদস্য হতে পারেন না। বস্তুত বোর্ড এবং সমিতি পরস্পরের কাজের তুলনামূলক হিসাব রাখে। বোর্ড এবং সমিতির মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতভেদ হয়, তবে কলখজের সমস্ত সদস্যের সভা ডাকা হয় এবং সে সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

প্রায় সমস্ত কলখজেই এই ধরনের সাধারণ ব্যবস্থা। তবে স্থানীয় পার্থক্যেরও দৃষ্টান্ত মেলে। তাসকন্দের কলখজে 'কর্মদিবস'-এর বেতন কুড়ি রুবল কিন্তু সমরকন্দে পনেরো। আমি যখন তাসকন্দে গিয়েছিলাম, তখন এক রুবলের বদলে আমাদের আট আনা মিলত, কিন্তু জিনিসপত্রের হিসাবে রুবলের ক্রয়শক্তি তখন বড়জোর তিন চার আনা ছিল। তাই বলা চলে যে একদিনের মেহনতে তাসকন্দের চাষী আন্দাজ চার পাঁচ টাকা রোজগার করত, সমরকন্দে তিন চার টাকা। টাকার হিসাবে এ উপার্জন খুব বেশী নয়, কিন্তু কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, আমাদের দেশে ব্যক্তিগতভাবে চাষীর পক্ষে তা পাওয়া দুষ্কর।

কলখজ অথবা কো-অপারেটিভের প্রথম যুগে ঘেভাবে জোরজার চলত, তাতে কৃষক বহুক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কখনো কখনো বিদ্রোহও করেছে। তবু কলখজের প্রভাবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এসিয়া অঞ্চলে সাধারণ কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য কোথাও আমি কলখজ দেখিনি, কাজেই ইয়োরোপীয় অঞ্চলে কলখজ কতখানি সার্থক হয়েছে বলতে পারি না। উজবেকিস্তানে যা দেখেছি তাতে আমার এই

ধারণাই হয়েছে যে ত্রিশ বৎসর আগে চাষীর কি মনোভাব ছিল জানি না কিন্তু বর্তমানে উজবেক চাষী কলখজকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছে এবং কলখজের কল্যাণে কৃষকের জীবনের মান অনেকভাবে উন্নত হয়েছে। মিণ্টার ক্রুশ্চভের আমলে পূর্বের অনেকগুলি অসুবিধা দূর হয়ে গেছে বলে বর্তমানে চাষীও কলখজকে আরো আগ্রহে গ্রহণ করতে সুরু করেছে। ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার তুলনা করে ভারতবর্ষে যদি আমরা স্বেচ্ছামূলকভাবে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রবর্তন করতে পারি, তবে ভারতবর্ষের কৃষিতে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখা দেবে, একথা নিঃসন্দেহ।

কবিতা

নাগর

অরুণকুমার সরকার

যার আসে, সহজেই আসে। আমার কেবল
কান পেতে অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে
খিলখিল হাসিতে, রঙ্গে। নাচি তাই। কিংবা যন্ত্রণার
গোঙানিতে। মাথা ঠুকি। যদি আসে স্মৃতির বন্যায়
এলোচুল অন্ধকারে। ভাবি। যদি আমারই দেহের
কবোষ্ণউত্তাপে আসে ম্লান জ্যোৎস্নায় নিশি-পাওয়া
উৎসুক বিহঙ্গ অঙ্গ। পেতে রাখি বাসশয্যা। আমার কেবল
অপেক্ষা, অপেক্ষা শুধু, অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে।

আসে না। গাছের ছায়া দেয়ালে ক্রমশ
গাঢ়তম হয়, কাঁপে। তারাগুলি স্পষ্ট, স্পষ্টতর।
দরজা জানলা খুলে তবু অপেক্ষায় থাকি যদি আসে।
আসে না হরবোলা ধ্বনি, বহুরূপী শব্দের মিছিল।
আমার ব্যাকুল দৃষ্টি দূর থেকে দূরে হেঁটে যায়।
দ্যাখে সবই মৌন, মূক, স্তব্ধ, নির্বিকার। সে আসে না।

পোষ্টার

অরুণ ভট্টাচার্য

পুরনো প্রাচীরপত্রে নানা রঙ-এ উজ্জ্বল নক্সায়
সাম্প্রতিক ইতিহাস রুদ্ধগতি।
দুরন্ত গরমে,
কলকাতার রাস্তাঘাটে নোংরা জল, বাতাবী লেবুর
শুকনো খোসা, ছিন্নপত্র, রৌদ্র, ঘাম, ধোঁয়ায় নরকে
মিলেমিশে একাকার। কয়েকটা কুকুর এককোণে
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ, নিরবলম্ব দিন
স্বপ্নসৌধ ভাঙ্গাগড়া, পোস্টারের রঙিন বিলাস
সনাতন ইতিহাসে প্রাগুক্তির সমর্থন মেলে।

মানুষের লোভ ঈর্ষা, রাজনীতি, দ্বন্দ্ব ও বিষাদ,
অসুস্থতা, পাপ পুণ্যে প্রাত্যহিক ঘটনাসংস্থান;
অথচ এক টুকরো ঘরে চন্দ্রোদয়ে নির্মল যামিনী
সুখে দুঃখে সমভাবে ঐশ্বর্য বিলাবে চিরদিন।

দেওয়ালের চারিপাশে কাঁটাতার, রজনীগন্ধার
অপরূপ সহবাসে যৌবনের দিনগুলি যায়॥

কাঁদার অপেক্ষা রাখে না

আবুল হোসেন

শব্দের বেড়া ভেঙ্গে চমকে যায় ট্রেন
অথবা বা সে অদৃশ্য শূন্যে পাড়ি দেয়া জেট প্লেন
দেখতে দেখতে গাঁয়ের খোলা মাঠ ছেড়ে
নিয়ে গেল চিলের মত ছোঁ মেরে
মসজিদ থেকে বুড়ো ইমামকে
স্কুলের ডেসকো, মাদ্রাসার চাল
ইয়াসিনের মা-মরা ছেলে মেয়ে, বকরীর ছাল
পিসিডেন্টের জরু গরু তামাম মালপত্তর
আমসত্তর হাঁড়ি, লবণের গুদাম।

যার বাড়ি আছে যার নেই
আত্মীয় স্বজন লোক লস্কর নিয়ে যে নাচে ধেই ধেই
আর যার শূন্য ঘর
টাকার কুমীর আর ন্যাংটো নটবর
লেঠেল জোয়ান আর তালপাতার সেপাই
কেউ পেলনা রেহাই।

অন্ধকারে দেশলাই খুঁজি
আচমকা মাড়াই বুঝি
ভিজে ঠাণ্ডা চুল
কখনো কানের দুল
শাড়ীটা, লুঙ্গিটা
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সারা ভিটা
হাত ঠেকে তেলানো সাম্পানে
দুমড়ানো ছাদের টিন গাছের গুঁড়ি
শুয়ে আছে বালি মুড়ি দিয়ে চরে
ফিরবে কে আর ঘরে?
ডাক ছেড়ে কাঁদবো?
বুকে তাবিজ বাঁধবো?
পাঁচ পয়সার সিন্নি দেবো মসজিদে?
ফকির খাওয়াব তিন বেলা
হুজুরের পা-বন্দী চেলা।

ক্লান্তি থেকে

মণীন্দ্র রায়

তখন রাত্রিকে আমি শোয়ালাম আমার পাশেই।
তখন স্বপ্নের গায়ে হাত রেখে অনুচ্চারে বলি :
এই বুক, এই মুখ, জঙ্ঘা-উরু রয়েছে তো সেই,
অন্ধ-হস্তিদর্শনের মতো তবু কেন সে সকাল!

মনের ওপিঠে মন, তারো নিচে কিমাকার ছায়া।
শত আলো-অন্ধকার সে জগতে ত্রিকোণ জ্যামিতি।
গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি যেন তার তীক্ষ্ণ মায়া।
কোন সূত্রে গাঁথো বলো সে বিচ্ছিন্ন পাতালের স্মৃতি?

ক্লান্ত, ক্লান্ত। বেজে যায় প্রহরের জগঝম্পগুলি।
হাসি-অশ্রু-উত্তেজনা স্নায়ুশিরা করে বিস্ফারিত।
এর স্পর্শ, ওর নাম, অর্ধ সুর, বর্ণহারা তুলি—
তীর্থের ভিখারী, আহা, সব পুণ্য করে-যে ধিক্কৃত!

তখন রাত্রিকে আমি পান করি প্রতি রোমকূপে;
তখন পতুল আর প্রতিমাকে মিশাই কাদায়।
উন্মাদের এ সংসারে মহামূল্য সব ভগ্নস্তূপে
সানন্দে লেহন করি কামনার আদিম জিহ্বায়।

রোপিত, রোপিত আমি, ঊর্ধ্বমূল অধোশাখ-তরু!
শূন্যতার আলিঙ্গনে খোলে নগ্ন জ্যোতির নির্ঝর।
বাজায় বিচ্ছিন্ন মনে হৃৎস্পন্দের একাগ্র ডমরু।
আবার সৃষ্টির কেন্দ্রে জন্ম আমি, অক্লান্ত ঈশ্বর॥

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

অমলেন্দু বসু

'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে'। মানে, রাজনীতির হাওয়া লেগেছে চাঁদের গায়ে। তাতে কাব্যের কোনো প্রচণ্ড লোকসান হয়নি বরং কাব্যপ্রতীকের ভাণ্ডারে দুয়েকটি নতুন সম্পদ জমেছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের হাওয়া লেগে কাব্যের কিছু বিপদ ঘটেছে বৈকি! স্মরণ করুন রবার্ট ব্রাউনিং 'ওআন্ ওঅর্ড মোর্' কবিতার শেষে স্ত্রীর উদ্দেশে কী ভাবে প্রেম নিবেদন করেছিলেন—

You—yourself my moon of poets!
Ah, but that's the world's side, there's the wonder,
Thus they see you, praise you, think they know you!
There, in turn I stand with them and praise you.

* * *

But the best is when I glide from out them,
Cross a step or two of dubious twilight,
Come out on the other side, the novel
Silent silver hights and darks undreamed of,
Where I hush and bless myself with silence.

আধুনিক কবির পক্ষে এমন আশ্চর্য ছত্র রচনা করা আর সম্ভব নয় কেননা সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রত্যয়ে তাঁর কাব্যপ্রত্যয় আহত হয়েছে। এই অতুলনীয় ছত্র কয়টির রূপকল্প শুরু হয়েছে এইভাবে : কবিপ্রিয়া যশস্বিনী কবি, অন্য কবিরা যেন নক্ষত্র মাত্র, তাঁদের মাঝখানে কবিপ্রিয়া যেন চাঁদ। এ কথা বলার পরে ব্রাউনিংয়ের কল্পনা আরো এগিয়ে গেল। চাঁদের সঙ্গে যশস্বিনী কবির একটি চমৎকার সাযুজ্য পাওয়া গেল। সবাই জানেন চাঁদের মাত্র একটি গোলার্ধ পৃথিবীর লোকের দর্শনসাধ্য, অন্য গোলার্ধ আমরা দেখতে পাই না। যশস্বিনী কবির ব্যক্তিত্বেরও যেন তেমনি দু'টি অংশ। তাঁর যশোমণ্ডিত কবিস্বরূপ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের আমদরবার, চাঁদের সর্বজনদৃষ্ট দিক। কবির অন্য সব গুণগ্রাহীর মতো ব্রাউনিংও চাঁদের এইদিক দেখে মুগ্ধ, এলিজাবেথ ব্যারেটের অন্তরঙ্গ প্রেমময়ী ব্যক্তিত্ব, কেবল তাঁর প্রেমিক ব্রাউনিংয়ের জন্যই, সে-ব্যক্তিত্বের খাস দরবারে শুধু ব্রাউনিংয়েরই আসন।

আজকের দিনে ব্রাউনিং কি এমন ছত্র লিখতে পারতেন? না কি বুদ্ধদেব বসুই ব্রাউনিংয়ের অপ্রচ্ছন্ন অনুকরণে এমন ছত্র আবারও লিখবেন?—

এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত?

('নতুন পাতা')

চাঁদের মুখফেরানো দিক তো আর মানুষের অজ্ঞাত নয়! রুষ বৈজ্ঞানিকগণ কি সেই অ-দেখা দিকের ফটোচিত্র তৈরি করেন নি? ক্রমশঃ এমন তো হবে যখন সে-অদেখা দিক অ-দেখা যদিও থাকে, অজ্ঞাত নিশ্চয় থাকবে না, আর অজ্ঞাত না থাকলে, অনবলোকিত নিভৃতের নিবিড়

অন্তরঙ্গতা যদি তার হারিয়ে যায়, তা'হলে ব্রাউনিংয়ের চিত্রকল্পটির যাথার্থ্য সাঙ্গ হবে না কি?

কাব্যপ্রত্যয়ের উপরে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লবী, প্রায় বিধ্বংসী অভিসংঘাত যে কতটা গুরুতর তা' বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কীট্‌স্ বলেছিলেন—

Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy with clip an Angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine—
Unweare a rainbow.

(*Lamia* II, 229-37)

এ-ছত্রগুলির তর্জমা করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এখানে মূল বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের ফলে আকাশ ও পাতাল থেকে অন্তর্হিত হয়েছে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরগণ, জগতের যাবতীয় জ্ঞানাতীত রহস্য স্তূপীকৃত হয়েছে মামুলি ঘটনার নিরাবেগ তালিকায়, হারিয়ে গেছে আকাশের মহান ইন্দ্রধনু, জীবনের মোহময় রূপ উবে গেছে বিজ্ঞানের শীতল ছোঁওয়া লেগে। (কীট্‌স্ এখানে ফিলসফি বলতে বুঝেছেন বিজ্ঞান। এককালে ফিলসফি ছিল দু'রকমের, natural philosophy অর্থাৎ আজ যাকে আমরা natural sciences বলি, সেই পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধ্যয়ন বিচার ও চিন্তন। আর ছিল moral philosophy অর্থাৎ যাকে আজকাল আমরা বলি philosophy, দর্শনশাস্ত্র। বিজ্ঞান অর্থে philosophy কথাটির প্রয়োগ বহু পুরাতন। বাঙলায় যাকে বলি স্পর্শমণি, পরশপাথর, ইংরেজিতে তাকে বলা হ'ত Philosopher's Stone, দার্শনিকেরা ব্যবহার করতেন বলে নয়, বরং বৈজ্ঞানিকেরা সে-পাথর নিয়ে কাজ করতেন সেজন্য, অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলতে তখনকার দিনে যাদেরকে বোঝাতো। কীট্‌স্ philosophy বলতে বিজ্ঞান বুঝেছিলেন তার আরো প্রমাণ পাই যখন পড়ি যে কীট্‌স্ ও চার্লস্ ল্যাম্ একদা সাব্যস্ত করেছিলেন যে Newton had destroyed all the poetry of the rainbow by reducing it to the prismatic colours, অর্থাৎ ইন্দ্রধনুর বর্ণালী মৌলিক বর্ণে বিশ্লেষিত করে নিউটন্ তার কাব্যগুণ নষ্ট করেছেন। এ ছাড়া, কীট্‌সের বন্ধু ও এককালীন গুরু লী হাণ্ট্ এই ছত্র কয়টি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেও প্রমাণ হয় যে ফিলসফি বলতে কীট্‌স্ বুঝেছিলেন বিজ্ঞান।)

কীট্‌স্ দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানে ও শিল্পে বৈপরীত্য। শিল্প charming, ইন্দ্রজালবিস্তারী, মোহময় তা'র রূপ, তাতে চিত্তে আবেগ জন্মে। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানের তুহিনশীতল স্পর্শে কাব্যের ও শিল্পের মোহন রূপ অন্তর্হিত হয়। কীট্‌সের তুলনায় অনেক নিরেশ কবি ছিলেন ক্যাম্‌বেল, তিনিও 'রেইন্ বো' অর্থাৎ ইন্দ্রধনু শীর্ষক কবিতায় অনুরূপ কথা বলেছেন—

Triumphal arch that fills the sky
When storms prepare to part,

I ask not proud Philosophy
To teach me what thou art.
* * *
When science from Creation's face
Enchantment's veil withdraws,
What lovely visions yield their place
To cold material laws!

আসন্ন ঝটিকার পথে নির্মিত হয়েছে ইন্দ্রধনুর বিজয়-তোরণ, তার স্তুতি গেয়েছেন কবি আর সেই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে বিজ্ঞানের জড়জাগতিক কানুনের ফলে কত অপরূপ দৃশ্য আজ হারিয়ে গেছে, সঙ্কুচিত হয়েছে জাদুর আবরণ। বিজ্ঞান ও শিল্প-কল্পনার বৈষম্য সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন ওয়র্ড্‌স্বোয়র্থ। এক প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলছেন যে খাঁটি বিপরীত হচ্ছে Poetry and Matter of Fact and Science, অর্থাৎ কাব্য একদিকে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষের ও বিজ্ঞানের তথ্য। তাঁর "প্রিলিয়ড্" নামক বিখ্যাত আত্মজৈবনিক কাব্যগ্রন্থের একাদশ সর্গে বলছেন—

There comes a time when Reason, not the grand
And simple Reason, but that humbler power
Which carries on its no inglorious work
By logic and minute analysis
Is of all Idols that which pleases most
The growing mind.

এই ধরনের তারতম্যই করেছিলেন পরবর্তী যুগের কবি টেনিসন্—

Who loves not knowledge? Who shall rail
Against her beauty? May she mix
With men and prosper! Who shall fix
Her pillars? Let her work prevail.
* * * *
Let her know her place;
She is the second, not the first.
A higher hand must make her mild,
If all be not in vain; and guide
Her footsteps, moving side by side
With wisdom, like the younger child:
For she is earthly of the mind,
But wisdom heavenly of the soul.

(*In Memoriam*, CXIV)

দুই কবি-ই তারতম্য করেছেন দু'রকম অন্তঃশক্তিতে, একটি মহৎ ও অমিতপ্রভব, অপরটি সীমায়িত ক্ষুদ্রবিচারী। ওয়র্ড্‌স্বোয়র্থ বলছেন 'রীজন্' বা চিৎশক্তির একটা দিক আছে সেটি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তঃশক্তি, সে-শক্তি আসলে সৃষ্টিশীল প্রতিভা, মানুষের পক্ষে তা' এক

দেবোপম সম্পদ। কিন্তু 'রীজন্' বলতে অন্য রকম চিৎশক্তিও বোঝা যায়, সেটি মানুষের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিজ্ঞানে ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা। এই দ্বিতীয়োক্ত শক্তিকে ওয়র্ডস্বোয়র্থ তুচ্ছ করছেন না কিন্তু বিনা দ্বিধায় বলছেন যে সৃজনীপ্রতিভার তুলনায় এ হীনশক্তি। টেনিসন্ যে উঁচু শক্তি 'উইস্‌ডম্' (প্রজ্ঞা) ও হীন শক্তি 'নলেজ্' (জ্ঞান, বোধ হয় বিজ্ঞান বলাই ভালো) এ-দুয়ের মধ্যে তারতম্য করেছেন তার ভেতরে খানিকটা অপার্থিব ঐশ্বরিক শক্তি, ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি ও জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞান, এ-দু'য়ের তারতম্য নিহিত বটে, কিন্তু এই অপার্থিব অন্তর্দৃষ্টিও বস্তুত সৃষ্টিশীল প্রতিভাশালী শৈল্পিক কল্পনার নিকট-গোত্র। অর্থাৎ, কীট্‌স্, ল্যাম্, ক্যাম্‌বেল্, ওয়র্ডস্বোয়র্থের মতো টেনিসন্‌ও অনুভব করেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে কাব্যের সমন্বয়ী কল্পনার কোথাও একটা সংঘর্ষ বিদ্যমান।

২

অথচ বিজ্ঞানে ও কাব্যে এমন কোনো বৈপরীত্যের ধারণা চিরকালই কিছু ছিল না। বিজ্ঞান বলতে যদি বুঝি পদার্থজগতের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণপন্থী সম্যক জ্ঞান, তা'হলে তেমন জ্ঞান নিয়ে মানুষ ব্যাপৃত থেকেছে অতি পুরাতন কাল থেকেই আর যদিও কোনো কোনো জড়-জাগতিক জ্ঞান হয়তো গোড়ায় গোড়ায় মানুষের অভ্যস্ত ধারণা ও অভ্যস্ত অনুভূতিগুলিকে পীড়া দিয়েও থাকে, তবুও অচিরেই এইসব নূতন জ্ঞান ও ধারণা অনতিআয়াসে মিশে গেছে শিল্পীর সমন্বয়ী প্রতিভার সঙ্গে। এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই যে প্রাক্-আধুনিক ইতিহাসে কবিচিত্ত ক্লিষ্ট হয়েছে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধারণার নিষ্পেষণে। বিজ্ঞান বা পদার্থ-জগতের জ্ঞান প্রাচীন কবির কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেনি কখনো, যদিও হয়তো অনেক সময়ই সে-শক্তিকে উদ্দীপিতও করেনি। ইওরোপীয় সাহিত্যে লুক্রেশিয়স্ ও দান্তের কাব্যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছে, কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো সংঘাত হয়নি। ইংরেজ কবি চসর্ ও মিল্‌টন্ সমসাময়িক কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, কোনো কোনো চিন্তায় তাঁদের কবিকল্পনা উৎসাহ পেয়েছিল। (স্মরণ করুন "প্যারাডাইস্ লস্‌ট্" মহাকাব্যে গ্যালিলিওর টেলিস্‌কোপ্ নিয়ে কী সুন্দর উপমা প্রস্তুত করেছেন মিল্‌টন্!) ভারতীয় কাব্যের প্রাচীনতম যুগেও সাযুজ্য ছিল কাব্যে ও বিজ্ঞানে, তৎকালীন বিজ্ঞানে। ঐতরেয়োপনিষদে (যথা, ১।১।১, ২।১।২, ২।১।৩) ও প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬, ৩।৭) জন্ম ব্যাপারের ও মানবদেহে নাড়ীসমূহের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তৎকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে সে সব সূক্তগুলি কাব্যগুণমণ্ডিত। মহাভারত তো সে যুগের যাবতীয় দার্শনিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অগাধ ভাণ্ডার বিশেষ। কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী নয়, কীট্‌সের প্রশ্নসত্ত্বেও। বিরোধিতার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। বিজ্ঞান মানে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি ও পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কতকগুলি উপায়। আধুনিককালে এ সব পদ্ধতি ও উপায় সংখ্যায় বেড়েছে, তাদের কার্য-প্রণালীও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, কিন্তু সুপ্রাচীন কালেও বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম মানুষের অজ্ঞাত ছিল না। বাঙলার প্রাচীন কাব্যে—খনা ও ডাকের বচনে, কাহ্ন পাদের চর্যাশ্লোকে—তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ধারণার (যত স্থূল ও অযথার্থ হোক না কেন সে সব ধারণা) কাব্যীভূত প্রকাশ হয়েছে বৈ কি! এহেন কাব্যীভূত প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছে, বাঙলা কাব্যে অথবা অন্যান্য বহু

কাব্যে, তার কারণ স্বচ্ছ। সেকালে জ্ঞানের জাতিভেদ ছিল না। এটি বৈজ্ঞানিক ওটি অবৈজ্ঞানিক, এটি ন্যাচ্‌রল্ ওটি সুপরন্যাচরল্, কোনো জ্ঞানের গ্রাহ্যতা ও প্রামাণ্যতা বেশি অন্য জ্ঞানের কম, এমন কোনো তারতম্য কেউ মানতেন না। তা'ছাড়া যদিচ এক চিন্তায় ও অপর চিন্তায় প্রচণ্ড প্রভেদ হতে পারত যেমন প্রশ্ন উঠতে পারত জগৎকারণের পরম সত্য কী সে-বিষয়ে (অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে, বৈশেষিক দর্শনে বা অন্যান্য দর্শনে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তের যে-অবতারণা) তবুও জ্ঞানার্জনের পন্থা সকলেরই ছিল এক ধরনের ও মানবিক চৈতন্য সর্ব দর্শনেই তুল্যমূল্য। সাংখ্যবাদী বা বৈদান্তিক কেউ-ই যার যার চিন্তার ফলে নিজ নিজ সাংসারিক আবেগ ও অনুভূতিগুলি থেকে ভ্রষ্ট হননি। অর্থাৎ সবারই জীবনাদর্শে ও জীবন-পদ্ধতিতে সঙ্গতি ছিল, তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে, মনীষায় ও অনুভূতিতে ছিল সাযুজ্য। সুতরাং কাব্যে বা শিল্পে যে-মানস রূপায়িত হয়েছে সে-মানস একটি সুডৌল, সর্বাঙ্গসুষম, সংতুলিত, integrated ও homogeneous মানস, আধুনিককালের শতধাবিচ্ছিন্ন সংক্ষুব্ধ সংগ্রামবিক্ষত শিল্পমানস নয়। এমন কথা বলছি না যে সেকালের শিল্পীমানস অবশ্যই একালের শিল্পীমানসের তুলনায় মহত্তর ছিল। (এ হেন সামান্যোক্তি নিতান্ত স্থূল-চিত্ত একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, সুতরাং সম্বিবেকী সমালোচকের পক্ষে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য।) আমার প্রতিপাদ্য যে সাহিত্যের ইতিহাসে বহুযুগ যাবত বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ে ও শিল্পায়নী কল্পনায় কোনো বৈপরীত্য বা সংঘাত বিদ্যমান ছিল না। যিনি বিজ্ঞানচর্চা করতেন শিল্পের পথ তাঁর কাছেও সুগম ছিল, যিনি ছিলেন শিল্পী তিনি বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে নিজ শিল্পভাবনার কোনো দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হননি। সেকালের সৃজনী মানস ছিল balanced, সংতুলিত। রোমক নাট্যকার টেরেন্স্ বলেছিলেন : সমগ্র মানবতাই কাব্যের এলাকায় পড়ে; যে-বিষয় মানুষ সংক্রান্ত তা' কখনো কাব্যের জগতে ভিন্‌দেশী হ'তে পারে না। বিজ্ঞানে মানবিক জীবনের একটি অংশ প্রোজ্জ্বল, অতএব বিজ্ঞানে ও কাব্যে কোনো ভয়াবহ বিপরীত-ধর্মিতা সম্ভব নয় আর সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমন কোনো বৈষম্য প্রকাশিত হয়নি। সে-বৈষম্য আধুনিক সাহিত্যেরই বিকার।

৩

কাব্যভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানের বৈষম্য শুরু কবে থেকে? এ-বৈষম্য ইওরোপীয় সাহিত্যে দেখা দেয় সতেরো শতকে, উনিশ শতকে তা'র মর্মন্তুদ রূপ প্রতিভাত কিন্তু তবুও তখন অবধি কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ দেখা দেয়নি, আর আজ বিশ শতকে সে-বৈষম্যের ফলে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা'তে হয়তো অনতিদূর ভবিষ্যতে এ-দু'য়ের গতিপথ একেবারেই ভিন্ন হ'য়ে পড়বে। আশঙ্কা হয় সে-ভিন্নতা কাব্যের পক্ষেই মারাত্মক হবে।

বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞায় কয়েকটি লক্ষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিয়ত আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, তথ্য নির্ভর সত্য, পরীক্ষাসাধ্য সত্য, কোনো বিশেষজনের বা বিশেষ দেশকালের সত্য নয়, য়ুনিভার্সল্ বা সার্বিক সত্য, এমন কোনো মতবাদ বা তত্ত্ব নয় যা শুধু পরম্পরাগরবশ। বাপ-দাদা বলে এসেছেন বা করে এসেছেন সেজন্যই কোনো বস্তু সত্য, অথবা গুরু থেকে শিষ্যে শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে চলে এসেছে ব'লেই কোনো মতবাদ অভ্রান্ত, অথবা স্বর্গত মেঘনাদ সাহা যে-মনোবৃত্তির প্রতি ঠাট্টা ক'রেছিলেন 'সমস্তই ব্যাদে

আছে' তেমন মনোবৃত্তিতে কোনো অপৌরুষেয় গ্রন্থের আপ্তবাক্যকেই ধ্রুব ব'লে মানা, সে-পন্থা বিজ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানের 'সিল্‌সিলাহ্' অথবা পরম্পরা ভুল থেকে কম ভুলে, অজ্ঞাত ও অসাধ্য থেকে কম অসাধ্য ও কম অজ্ঞাতে পৌঁছবার এবং অবশেষে নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরীক্ষাসাধ্য সত্যে পৌঁছবার ক্লেশময় দুরূহ নিরলস প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক সত্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোনো গূঢ় অনিকেত ব্যাপার নয়, রুদ্ধদ্বার গহ্বরে গুগ্‌গুলে ধূপের ধোঁয়ায় আধিদৈবিক মায়ায় ও প্রেরণায় সে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয় না, সে-সত্য গণিতের তর্কে ধরা পড়ে, ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-যন্ত্রে তার সিদ্ধি। বিজ্ঞানের এ-রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরো শতকের ইওরোপে—টাইকো ব্রাহে, কোপার্নিকাস্, কেপ্‌লার, রবর্ট বয়ল্, গ্যালিলেও, নিউটনের ইওরোপে। এতকাল সত্য ও মিথ্যা ছিল দার্শনিক তত্ত্বে নিহিত, এখন থেকে সত্য মানে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য, অন্য সব কিছু কপোলকল্পনা। বেকন্ বললেন, সবার উপরে dry light of reason, যুক্তির অনার্দ্র আলোক, সে-আলোকে নৈর্ব্যক্তিক, সে-আলোকে ব্যক্তিবিশেষের সেণ্টিমেণ্ট বা আবেগের সাতিসেতে রামধনু খেলে না। এই সত্যনিষ্ঠ, পরীক্ষাপ্রমাণতথ্যনিষ্ঠ, নির্মম তন্ময় জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত হ'লেন সতেরো শতক থেকে শত সহস্র বিজ্ঞানকর্মী আর এই আবেগ-অনার্দ্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মানুষের চিন্তাধারা যে কী পরিমাণে বদলে গেল তা'র একটি সুন্দর উদাহরণ পাই অধ্যাপক বেস্‌ল্ উইলির গ্রন্থের ("দি সেভেন্‌টিন্‌থ্ সেঞ্চুরী ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড") প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে motion বা গতি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সন্ত টমাস্ অ্যাকোয়ানাস্ এবং সতেরো শতকী গ্যালিলেওর প্রত্যয়ের প্রভেদ বর্ণিত হয়েছে। সতেরো শতকের পূর্বে বিজ্ঞানকর্মীর যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, স্বতন্ত্র জ্ঞান লক্ষ্য ছিল, এমন বলা যায় না কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞানকর্মী নিজ কর্মের উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় অবহিত হলেন, আর যেহেতু সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁর কাম্য সেজন্য বিজ্ঞানবহির্ভূত অন্য সব জ্ঞানপন্থাকেই তিনি মনে করলেন কপোলকল্পনা। এ যুগে ফ্রান্‌সিস্ অস্‌বর্ণ নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) যে ছেলে যেন গণিত ও বটানি ভালোমতো অধ্যয়ন করেন কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রচলিত বিদ্যাগুলি 'but Lumber and Formes' অর্থাৎ গুদোমঠাসা মাল আর বাঁধিগৎ মাত্র। যাকে আজকাল বলা হয় empirical truth, পরীক্ষানির্ভর ইন্দ্রিয়গোচর সত্য, সে-সত্যের সপক্ষে তুচ্ছ হ'ল অতীন্দ্রিয় সত্যের উপলব্ধি, আর তা'র ফলে যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে টেক্‌নলজি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল, দ্রব্যোৎপাদনপদ্ধতি হ'তে থাকল দক্ষ থেকে দক্ষতর, তেমনি জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'তে থাকল আর অসংখ্য বিষয়ে মানুষের ঘর গেরস্থালী হ'য়ে উঠল স্বচ্ছন্দ নিরাপদ। সাধারণ মানুষেরও চিন্তার কাঠামো খানিকটা বদলালো। আমরা কথায় কথায় দোহাই দিতে লাগলাম scientific point of view-এর, scientific outlook-এর, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। আপ্তবাক্যে অবশ্য শিথিল হ'তে হ'তে কবে যেন একেবারেই উবে গেল, ভক্তিমার্গের বদলে যুক্তিবাদ প্রবল হ'ল জীবনে।

এই যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান খারিজ করে' ইন্দ্রিয়গম্য তথ্যপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানকে মহত্তর মূল্য দেওয়া গেল তার পরিণাম হ'ল গভীর ও দূরপ্রসারী। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঘায়েল হ'ল মানব-সভ্যতার দুটি প্রধান অঙ্গ—ধর্ম ও কাব্য। কাব্য ও ধর্ম দুইয়েরই মূল ভিত্তি 'ইন্‌ট্যুশন্'-এ স্বজ্ঞায়, যুক্তির অতীত বোধিতে। ধর্মের ও কাব্যের সিদ্ধি যুক্তিতে আবদ্ধ নয়, যুক্তির সীমানার বাইরে উজ্জ্বল কল্পনা ও অনুভূতির তুরীয় শক্তিতে এরা সার্থক।

অন্তিম বিচারে এদের প্রতীতি অলৌকিক, অন্তত লোকাতীত। সতেরো শতকে যখন ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন দর্শন প্রস্তুত করলেন তখন দৃঢ়ভাবে বললেন যে একমাত্র তাকেই সত্য বলা যাবে যা' গাণিতিক তর্কশৃঙ্খলায় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করা যায়। বেস্‌ল্ উইলি লিখছেন : After Descartes, poets were inevitably writing with the sense that their constructions were *not true* and this feeling robbed their work of essential seriousness (দেকার্তের পর থেকে কবিদের লেখায় এই অনতিক্রম্য ধারণা প্রকাশ পেতে থাকলো যে তাঁদের রচনা সত্য নয়, অনৃতভাষণ মাত্র, আর এ-ধারণার ফলে তাঁদের রচনার গাম্ভীর্য নষ্ট হ'য়ে গেল।) সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক লক্ বললেন যে কাব্য থেকে আমরা পাই কেবল pleasant pictures and agreeable visions (মনোহর চিত্র আর নয়নতৃপ্তিদায়ক ছায়াদৃশ্য) অথচ এসব চিত্র আসলে সত্যে ও যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অতএব অলীক, আষাঢ়ে গল্প মাত্র। কবিতা খুব সারবান পদার্থ কিছু নয়, ক্ষণিকের খেলনা, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের এবম্বিধ বিচারের বোধহয় চরম উক্তি মিলবে উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা বিখ্যাত ইউটিলিটেরিয়ান (উপযোগবাদী) দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের "র‍্যাশনাল্ অব্ রিওঅর্ড" গ্রন্থে—

> It is not proper to regard the arts and sciences of amusement as destitute of utility ; on the contrary ; there is nothing the utility of which is more incontestable. To what shall the character of utility be ascribed, if not to that which is a source of pleasure? All that can be alleged in diminution of their utility is, that it is limited to the excitement of pleasure: they cannot disperse the clouds of grief or of misfortune. They are useless to those who are not pleased with them: they are useful only to those who take pleasure in them.
>
> Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it is more valuable than either.....Indeed, between poetry and truth there is a natural opposition: false morals, fictitious nature. The poet always stands in need of something false.....Truth, exactitude of every kind, is fatal to poetry.

(এমন মনে করা সংগত হবে না যে আমোদদায়ক শিল্পগুলি নিতান্তই উপযোগ-রহিত। বরঞ্চ অন্য কোনো ব্যাপারেই এমন নিঃসংশয় উপযোগ পাওয়া যায় না। যে বস্তু প্রমোদের উৎস তাকেই যদি উপযোগসম্পন্ন মনে না করি তাহলে করব কাকে? যদি বলতে হয় যে এদের [শিল্পগুলির] উপযোগ কিছু ক্ষুণ্ণ তাহলে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে-উপযোগ কেবল প্রমোদ-উত্তেজনাতেই সীমাবদ্ধ; শিল্প দ্বারা দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ অপসরণ করা যায় না। যাঁরা

শিল্পে খুশি না হন তাঁদের পক্ষে শিল্প নির্মূল্য, যাঁরা শিল্পে খুশি হন তাঁদের পক্ষে এর উপযোগিতা সক্রিয়।

কোনো জাতক্রোধে দোষী না হ'য়েও বলা যেতে পারে যে সঙ্গীত ও কাব্যকলা এবং পুশ্‌পিন্‌ নামক খেলা সমমূল্য। যদি পুশ্‌পিন্‌ খেলায় বেশি প্রমোদ লাভ হয় তাহলে সে-খেলা সঙ্গীত ও কাব্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান। বস্তুত কাব্যে ও সত্যে এক স্বাভাবিক বিশ্বেষ বর্তমান। কাব্যের নীতি মিথ্যা, প্রকৃতি অলীক। কবির পক্ষে সব সময়ই মিথ্যার প্রয়োজন। সত্য বা কোনো-রকম যথার্থ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক।)

বেন্থামের কথা বড়ই রূঢ়, কবিতা লক্ষ্মী যদি শিউরে ওঠেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কবিতার লাঞ্ছনা ইতিপূর্বেও কয়েকবার ঘটেছে। প্লেটোর আদর্শ রাজ্যে কবিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার কারণ নিতান্তই দার্শনিক বটে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে প্লেটোর যুক্তিতেও কাব্যের কারবার অলীক বস্তু ও অনুতভাষণ নিয়েই। কয়েক শতাব্দী পরে সেণ্ট্‌ অগাস্টিন্‌ কাব্যবিরোধী হয়েছিলেন নিছক নৈতিকতার যুক্তিতে। কিন্তু লক্‌ থেকে বেন্থাম অবধি যে কাব্যতত্ত্ব প্রচারিত হ'ল, বলা যে হ'ল কাব্যের কোনো বিশেষ মূল্য নেই কাব্য একটা হাল্‌কা বাসন মাত্র, এমন গুরুতর আঘাত কাব্যলক্ষ্মী কখনো পাননি, আর সে-আঘাত থেকে যে আদৌ আরোগ্যলাভ করেছেন এমন কোনো লক্ষণ আমি অদ্যত দেখতে পাচ্ছি না। এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমি মন্তব্য পেশ করেছি যে সতেরো শতকের পূর্বে শিল্পভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ ছিল না। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি অ্যানটমি জানতেন, নারীদেহের অপরূপ সুষমাও জানতেন। বিরোধ শুরু হয় সতেরো শতকে আর তার পর থেকে শিল্পভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হতে লাগল তাকেই (ফরাসী লেখক রেমি দা গুর্ম'র একটি বাক্‌ভঙ্গী প্রয়োগ করে) টি এস্‌ এলিয়ট বললেন dissociation of sensibility, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ। এলিয়ট বলছেন যে সতেরো শতকের কবিদের (পশ্চিম ইওরোপীয় বিশেষত ইংরেজ কবিদের) এমন এক অন্তঃশক্তি ছিল যার ফলে তাঁরা সর্বজাতীয় অভিজ্ঞতা পরিপাক করে ফেলতে পারতেন, তাঁদের বুদ্ধিতে ও অনুভূতিতে কোনো বিরোধ থাকত না, সুতরাং তাঁদের শিল্পক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কোনো ব্যবচ্ছেদ ঘটত না। শিল্প সৃষ্টিকারী সর্বভুক সেই অগ্নি বৈশ্বানরের শক্তি সতেরো শতক থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আজ ইওরোপে দান্তে ও শেক্সপীয়রের মতো শিল্পী পাওয়া যায় না যাঁর সৃজনীপ্রতিভায় সে-বৈশ্বানর শক্তি বিদ্যমান।

৪

কাব্যের এই প্রচণ্ড সংকট সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কীট্‌স্‌ ওয়র্ড্‌স্বোয়র্থ টেনিসন্‌ প্রমুখ উনিশ শতকী কবিগণ। শুধু অবহিত ছিলেন না, এ-সংকটের সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকী ইওরোপীয় কাব্যতত্ত্বের মস্ত বড়ো ধারায় দেখতে পাই কাব্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল কী ভাবে? কাব্যবিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে কাব্যের কারবার মিথ্যা নিয়ে, সত্য মানে তথ্যের ও যুক্তির সত্য, তা'ছাড়া অন্য কোনো সত্য নেই। উনিশ শতকী কাব্যতাত্ত্বিক বললেন, তা' নয়, তথ্যের ও যুক্তির

সত্য তো ক্ষণিকের সত্য আংশিক সত্য স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ সত্য। তার চেয়ে মহত্তর সত্য নিরবধিকালে নিঃসীম কল্পরাজ্যে বিচরণ করে, পরাজগতের সেই চির-অম্লান সত্য নিয়েই কবির কারবার। কাব্যের সত্যে ও তথ্যের সত্যে প্রভেদ বিশাল।

কিন্তু পরাজগতের সত্য কবির সাধ্যায়ত্ত হয় কী ভাবে? গোড়ায় এ নিয়ে কিছু অপরিচ্ছন্ন চিন্তা দেখা দিয়েছিল কিন্তু ক্রমে কাব্যতাত্ত্বিক মাত্রেই মানতে লাগলেন যে কবির শিল্পীর একটা বিশেষ অসামান্য অন্তঃশক্তি আছে, সে-অন্তঃশক্তি মামুলি যুক্তির চেয়ে অনেক অনেক গভীরতর মহত্তর উজ্জ্বলতর শক্তি, সে-অন্তঃশক্তিকে বলা হবে কল্পনাশক্তি, ইম্যাজিনেশন্‌, যাকে গ্রীকরা বলতেন ফ্যান্‌টাসিয়া আর সংস্কৃত দার্শনিক বলতেন প্রতিভা। ওয়র্ড্‌স্বোয়র্থ-কোল্‌রিজ্‌-রস্‌কিন এই কল্পনাশক্তির বর্ণনা করলেন। শেলিং-স্পেগেল্‌-নোভালিস্‌-কাণ্ট বিশ্বাস করলেন যে সাধারণ যুক্তিবাদের তুলনায় এই প্রতিভাবাদ অনেক বেশি গ্রাহ্য। কবি প্রতিভায় যে লোকের প্রত্যয় কত বেশি ফিরে আসতে লাগল তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌-এর উক্তিতে। মিল্‌ ছিলেন বেন্থামের আত্মিক উত্তরাধিকারী অথচ তিনিই তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে কাব্য সম্বন্ধে বেন্থামী সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। বেন্থামবাদ বা উপযোগবাদে মনে করা হয়েছে যে মানুষ কেবল যুক্তিপরায়ণ, মানুষ যে আবেগ ও অনুভূতির জটিল পিণ্ড সে কথা মানা হয়নি আর এই অস্বীকরণের ফলে বেন্থামবাদে মস্ত ত্রুটি থেকে গেছে—এই কথা বললেন মিল্‌। মিল্‌ আরো বললেন যুক্তি যেমন সত্যের মার্গ, প্রজ্ঞা বা কল্পনাও তেমনি সত্যপন্থী। কাব্যে এই স্বজ্ঞান কল্পনার প্রকাশ, অতএব কাব্যকে অবহেলা করলে সুখমজ্জস সত্যে পৌঁছনো যায় না।

ইতিপূর্বেই ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিরা শিল্পকল্পনায় পেয়েছিলেন পরম সত্যের সন্ধান। এখন কাণ্ট ও মিল্‌-এর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ তার্কিকদের সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প-কল্পনার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শিল্পকল্পনার গৌরব পুনরুজ্জীবিত হ'ল বটে কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হ'ল কি? কাব্যের ও বিজ্ঞানের, সঞ্জার ও জ্ঞানের, কল্পনার ও বুদ্ধির যে-বিচ্ছেদ ও বিরোধ জন্মাচ্ছিল, অখণ্ড সত্যের যে-দ্বৈততা শুরু হয়েছিল, যে-ব্যবচ্ছেদ সংবেদনায় সতেরো শতক থেকে কবিগণ পীড়িত হচ্ছিলেন, সে-বিচ্ছেদ বিরোধ দ্বৈততার কোনো সুরাহা তো হ'ল না! সতেরো শতকী কবির বুদ্ধিগম্য প্রত্যয়ে ও সহজ অনুভূতিতে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা ছিল না, সতেরো শতকের পর থেকে আজ অবধি ক্রমেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিমথিত বেদনায় বিশ্বের শিল্পীচিত্ত শতধা থেকে সহস্রধা, ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর ব্যাকুল এবং বিকল। কবি এবং কাব্যতাত্ত্বিক বললেন স্বজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল কল্পনায় যে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয় সে-সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ সত্য, তথ্যের সত্য ধ্রুব নয় অতএব সত্যও নয়। কিন্তু একথা মানবেন না কোনো বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষার সত্য, তথ্যপরায়ণ যুক্তি ও বিচারের সত্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবশ্য আঠারো শতকী ও উনিশ শতকী বৈজ্ঞানিকের মতো জড়বাদী নন, তাঁর জগৎ আর সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ নয়, হাইসেনবার্গের প্রিন্‌সিপ্‌ল্‌ অব্‌ ইন্‌ডিটারমিনেসি'র পরে বিজ্ঞান চিন্তায়ও এক আশ্চর্য ঔদার্যের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্য-প্রিয়তা যুক্তিনির্ভরতা তো কিছুমাত্র কমেনি, কমবার কোনো লক্ষণ নেই কারণও নেই। আর এই বিজ্ঞানই দিনের পর দিন সর্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতো নিজ সাম্রাজ্য বাড়িয়ে

চলেছে। আমাদের জ্ঞান বাড়ছে প্রতিদিন, সাংসারিক ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বাড়ছে, প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগের অজস্র বিপদ অসুবিধা থেকে আজ আমরা মুক্ত, পূর্বকালীন অলীক সংস্কার ও প্রত্যয়গুলি ধ্বসে' পড়ছে একে একে, আজকের জগৎ প্রায় বিজ্ঞানময়। অপরপক্ষে কাব্যের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, কীট্‌স্‌-এর আশঙ্কা যেন কার্যকরী হয়েছে। যে-পৌরাণিক ও আধিদৈবিক প্রত্যয়ে অজস্র প্রাচীন কাব্য প্রতিষ্ঠিত সে সব প্রত্যয় আজকের দিনে গ্রাহ্য নয়, কোনো আধুনিক কবি আর "ডিভিনা কম্‌মেডিয়া" ও "প্যারাডাইস্‌ লস্ট" লিখতে পারেন না, ওবেরণ-টিটানিয়া-ক্যালিবান্‌-এরিয়েল্‌ আজ অন্তর্হিত। যদি কোনো আধুনিক কবি নেহাৎই পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নেন তাহলে সে-কাহিনীকে প্রতীক-রূপে ব্যবহার করতে হয় যাতে কিনা প্রতীকিত অর্থ চলতি দুনিয়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে মানানসই হয়। অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনীটি উপলক্ষ মাত্র, তার মৌল মূল্য নেই। তাছাড়া কাহিনীর প্রাচীন প্রত্যয় ও তার আধুনিক প্রতীকিত প্রত্যয়ের বিভেদে একথাও প্রমাণ হয় যে যে বস্তু কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে সে বস্তুতে তার বুদ্ধির সায় নেই, অর্থাৎ এলিয়ট-কথিত ডিসোসিয়েশন্‌ অব্‌ সেন্‌সিবিলিটি, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ প্রবল হয়েছে। আধুনিক কবি যখন কাব্যরচনা করেন তিনি যেন উটপাখির মতো চারিদিককার বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশাল জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে অস্থির বালুকার ক্ষুদ্র কন্দরে মাথা গুঁজে এক কল্পনারাজ্য রচনা করেন। কাব্য যেন এক পলায়ন পন্থা। এই পলায়না-পন্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমেরিকান কবি হার্ট ক্রেইন্‌-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব।

> The familiar contention that science is inimical to poetry is no more tenable than the kindred notion that theology has been proverbially hostile—with the *Commedia* of Dante to prove the contrary. That 'truth' which science pursues is radically different from the metaphorical, extra-logical 'truth' of the poet. When Blake wrote that "a tear is an intellectual thing, And a sigh is the sword of an Angel King"—he was not in any logical conflict with the principles of the Newtonian Universe.

(সচরাচর তর্ক ওঠে যে বিজ্ঞান কাব্যের শত্রু, এ-তর্ক তেমনি অগ্রাহ্য যেমন সংশ্লিষ্ট ধারণা যে ধর্মতত্ত্বও কাব্যের শত্রু; দান্তের "কম্‌মেডিয়া"তে উল্টো কথাই প্রমাণ হয়। বিজ্ঞান যে-সত্যের অভিসারী সে-সত্য কবির রূপকাশ্রিত, ন্যায়শাস্ত্রের অগম্য সত্য থেকে সম্পূর্ণত পৃথক। ব্লেইক যখন লিখেছিলেন "অশ্রুবিন্দু মনোভব বস্তু আর দেবদূতরাজের তরবারি হ'ল দীর্ঘশ্বাস", তখন তিনি এমন কোনো কথা বলেননি যা নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিধিনিয়মের বিরোধী।)

হার্ট ক্রেইনের এ-উক্তির ঠুন্‌কো চালাকি ধরতে বেশি বেগ পেতে হয় না। প্রথম কথা, কেউ একথা বলেনি যে দান্তের জীবৎকালে ধর্মতত্ত্বে ও কাব্যে সে-বৈরিতার উদ্ভব হয়েছিল যা ইদানীং হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্লেইকের রূপক নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধী নয় বটে কিন্তু আসলে সে-ব্রহ্মাণ্ডে এসব রূপকের স্থানই নেই, এহেন রূপক নিয়ে কারবারই চলে না। তৃতীয়ত (এবং সব চেয়ে বড়ো কথা), হার্ট ক্রেইন বলছেন (অন্য

অধিকাংশ কবিও এমন কথা বলছেন) যে কাব্যের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্য প্রভিন্ন। এ কথাতেই আধুনিক কাব্য দর্শনের মৌল দুর্বলতা।

সত্য দুই রকমের, বিজ্ঞানের সত্য ও শিল্পের সত্য, আর শিল্পের সত্যই মহত্তর সত্য এহেন বিশ্বাসের প্রচারে কাব্যের মহতী ক্ষতি হয়েছে। কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক কাব্যকে প্রত্যক্ষ পৃথিবীর অতীতে কোনো অলক্ষ্য অবাস্তব (সুতরাং অলীক) জগতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক শিথিল হচ্ছে, পরিণাম কাব্যের পক্ষে শক্তিপ্রদ নয়। কিছুকাল পূর্বে 'কাব্যপ্রত্যয়'-নামা এক প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে কাব্যের প্রত্যয় ও ব্যবহারিক প্রত্যয় মিলে' মিশে' অভিন্ন হ'তে পারে আবার বিভিন্নও হ'তে পারে, বস্তুত অধুনা প্রায়ই তেমন হ'য়েও থাকে। কিন্তু সে কথার মানে নয় যে যে বস্তু কাব্যে সত্য, ব্যবহারিক জীবনে তা' সত্য নয়। আমি লিখেছিলাম লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয় স্বতন্ত্র বস্তু। প্রাক্‌ কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ-দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলটিতে। আসলে এ হচ্ছে শুদ্ধীকরণের উন্নয়নের প্রভেদ। যেন কাঁচা মাল ও তৈরি মালের প্রভেদ। কিন্তু শুদ্ধীকৃত কাব্যবস্তু (আমি সৎ কাব্যের কথাই বলছি) মিথ্যা হ'তে পারে না, প্রাক্‌শোধন কাব্যবস্তুও তেমনি মিথ্যা হ'তে পারে না। বস্তুত সমগ্র কাব্য প্রক্রিয়ায় মিথ্যার স্থান নেই। সে-যুক্তিতেই উক্ত প্রবন্ধের শেষ দিকে আমি আরো লিখেছিলেন, কাব্য সৎ হ'তে হ'লে কবিকেও হ'তে হবে সৎ, কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে থাকবে না কোনো দুস্তর ব্যবধান।

হার্ট ক্রেইন্‌ যা' বলেছেন, যেমনধারা কথা অনেক উনিশ ও বিশ শতকী কবি বলেছেন ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে ও অন্যত্র (পণ্ডিতম্মন্য তালিকা প্রস্তুত করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়), সেই রোমাণ্টিক চিন্তাধারায় দুস্তর ব্যবধান, কাব্যেরই পক্ষে পরম হানিকর ব্যবধান, গড়ে' উঠেছে কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে। হানিকর কেননা মানব সমাজের পক্ষে মনে করা সম্ভব নয় যে বিজ্ঞান মিথ্যা, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ভুয়া চাতুরী, অথচ পুঞ্জীভূত সত্য একমাত্র কবিকল্পনায়। যদি কোনো কালে বেছে নেওয়ার সমস্যা আসে তাহলে মানবসমাজ বেছে নেবে বিজ্ঞানকেই।

৫

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আসলে সাহিত্যিকের চিত্তে বিজ্ঞানের প্রভাব। ইওরোপে এ-প্রভাব দেখা দিয়েছিল মর্মন্তুদ তীক্ষ্ণতায় উনিশ শতকে, বাঙলা সাহিত্যে সে-শতকে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বহুস্পর্শী শক্তিধর প্রতিভায় ছাড়া অন্য কোনো লেখকের চিত্তে এ-বিষয়ে কোনো চেতনা ছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ পড়েছিলেন, বিজ্ঞানের পটভূমিতে যে-নূতন দর্শন গড়বার চেষ্টা হচ্ছিল ইওরোপে তা'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" "ধর্মতত্ত্ব" ও "শ্রীমদ্ভগবদগীতা" প্রভৃতি আলোচনায় সে-দর্শনগ্রাহী যৌক্তিকতার প্রমাণ। মাইকেল ছিলেন এ বিষয়ে অনবহিত। বঙ্কিমচন্দ্র ইওরোপে যাননি, মাইকেল গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ইওরোপ জানতেন, মাইকেলের ইওরোপ, পেত্রার্ক ও ফাঁসোয়া ভিল'র ইওরোপ, আরও পূর্বেকার ভর্জিলের ইওরোপ। যে-মিল্‌টনের কাব্য তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এমন কি সে-মিল্‌টনেরও যে-শৈল্পিক সমস্যা তীব্র ছিল (বেস্‌ল্‌ উইলি যা'কে বলেছেন, The Heroic Poem in a Scientific Age)

সে বিষয়ে মাইকেল অবহিত ছিলেন না। তাঁর সমস্যা ছিল 'হেরোয়িক পোয়েম্'-এর সমস্যা, 'সায়েণ্টিফিক্ এইজ্'-এর নয়।

কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয় যে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অভিসংঘাত সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। সে-চিন্তার কিছু নিদর্শন "সাহিত্যের পথে" নামক রচনা সংগ্রহে। তিনি বলেছেন, 'বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না।' তিনি বললেন যে আধুনিক কাব্যের কাজ 'মনোহারিতা নয় মনোজ্ঞিয়তা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যাথার্থ্য।' আরও বললেন যে, 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।' এসব উক্তিতে প্রমাণ হয় যে যন্ত্রপ্রধান ব্যবহারিক জীবন ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানচিন্তা আধুনিক কাব্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। বস্তুত তাঁর শেষ দিককার লেখায় যে বিষয়াত্মতা প্রবল তা' কী পরিমাণে এই বিজ্ঞানচেতনা থেকে উৎসারিত সে কথার আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা যত গভীর যত যথার্থ হোক না কেন, সে-চেতনা তাঁর সমগ্র জীবন দর্শনকে কখনো বিভ্রান্ত করে নি, বিজ্ঞানের তত্ত্বে তিনি এমন কিছু পাননি যার দরুণ তাঁর জীবনবোধ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারত। ব্রাহ্ম সমাজের মুক্ত সংস্কার আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে, মহর্ষির গম্ভীর ও উদার ঔপনিষদিক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে', উনিশ শতকী ইওরোপের লিব্র্যাল হিউম্যানিজম্ আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম করে' রবীন্দ্রনাথ এমন এক দার্শনিক ভারসাম্যে পৌঁছেছিলেন যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপ্রচণ্ড বহুসংস্কারধ্বংসী তত্ত্বগুলি কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে ইওরোপসুলভ ব্যবচ্ছিন্ন সংবেদনার আভাস নেই। তাঁর মণীষায় ও আবেগে, প্রত্যয়ে ও কর্মে সে-অসংগতি ও বৈরিতা নেই যা' বহু আধুনিক ইওরোপীয় কবির রচনায় প্রকট এমন কি তাঁর কোনো বঙ্গীয় উত্তরসূরীতেও পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য সমভাবেই নিটোল সর্বাঙ্গসুষম। আধুনিক বিজ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানস্বারা প্রভাবিত আধুনিক কাব্যের কোনো ত্রুটি তিনি দেখতে পাননি তেমন নয়। বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, 'যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে দেশের সাহিত্যে ধার করা সকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?' ক্রুদ্ধ উক্তি, কিন্তু যেকালে এ-উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তখন নিতান্ত অযথার্থ ছিল না। যাঁরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বাঙালী সাহিত্য জীবনে ভাগীদার ছিলেন তাঁরা জানেন যে বিজ্ঞান চিন্তা সে-কালে বঙ্গীয় মনীষায় প্রবেশ করেনি, ততটুকুও করেনি যতখানি বিজ্ঞানী মনোভাব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রের সাহচর্যে। দুচারজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কথা বলছি না, প্রবীণ বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তখনকার দিনে বিজ্ঞান দূরশ্রুত বাঁশরীধ্বনি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কশাঘাতের যাথার্থ্য স্বল্পক্ষণস্থায়ী কেননা তাঁর এই উক্তির সময়েই এক তরুণতর কবিগোষ্ঠী সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করছিলেন (আজ তাঁরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীণ, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ইহধাম ত্যাগও করেছেন)। তরুণতর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান সচেতন বলে আমার মনে হয়। এঁরা যাঁর যাঁর কাব্যধারণার সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার সাযুজ্য ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, অন্য কোনো কবি তেমনটি করেননি বলে' আমার অনুমান। কোনো আধুনিক কাব্যোৎসাহী

হয়তো এ-বিষয় অধ্যয়ন করে' দেখবেন, অধ্যয়নের যোগ্য বিষয়।

একটা ভাসা ভাসা অর্থে বিজ্ঞান চেতনা কোনো কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাশা!
কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকুটি।

তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইট্রোজেন ক্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়—
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে।

নপুংসক বর্তমান ক্রুদ্ধ রাসায়নিকের মতো
রক্তময় অতীতের বাঁজাণু মিশায় অবিরত।

বাঙালী কবি বিজ্ঞানচেতনায় উদ্দীপিত নন ব'লে আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি না কেন না এইন উদ্দীপনার অভাব ইওরোপীয় কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। এককালে যখন আমি ভিক্টরীয় যুগের ইংরেজি কাব্য অধ্যয়নে নিরত ছিলাম তখন সমসাময়িক বিজ্ঞানের দ্রুতবেগপ্রগতি লক্ষ্য করে' প্রথমে মনে করলাম যে তাহলে এ-বিজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া নিশ্চয় কাব্যেও মিলবে। বাস্তবিক কাব্যপাঠে প্রতিপন্ন হ'ল আমার সে-অনুমান অযথার্থ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তকার ইংরেজি কাব্যে আমি মাত্র গুটি কুড়ি ছত্রস্তবক পেয়েছিলাম যাতে আদৌ বিজ্ঞানের কোনোরকম প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। এজন্য তিন শ'র অধিক কাব্যগ্রন্থ আমাকে ঘাঁটতে হয়েছিল—খ্যাতনামা আবার নিতান্তই কালজীর্ণ বিস্মৃত গ্রন্থ। এই ছত্রস্তবকগুলি ছাড়া অবশ্য টেনিসন্ ও ব্রাউনিংয়ের কিছু কাব্য, 'প্যারাসেল্‌সাস্', 'দি টু ভয়সেস্', 'দি প্রিন্‌সেস্', 'ইন্ মেমরিয়ম্'। গবেষণার নগণ্য পরিণতি! কিন্তু আসলকথা এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে ফ্যারাডে ডারুইনের যুগেও ইংরেজ কবিচিত্তে বিজ্ঞান-চেতনা ছিল না। বাঙালী কবিচিত্তে আজও সে-চেতনা এসেছে কিনা আমার সন্দেহ। যখন বাঙালী কবি বলেন,

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস

তখন তাঁর প্রত্যয়তৃষ্ণা মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসের জন্যই আকুল কিন্তু কেন যে বিগত কালের বিশ্বাস অটল ছিল আর সে-বিশ্বাস আজ অন্তর্হিত, এ-অন্তর্ধানের মূল কারণ যে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অভিসংঘাত এমন ধারণা পাওয়া যায় না সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে, অন্তত সাক্ষ্যগুভাবে পাওয়া যায় না। কবির আবেগের উপলক্ষ 'অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান', যুগযুগব্যাহিত ঈশ্বরকল্পনা। এ হেন ঈশ্বরসংশয় অথবা নিরীশ্বরপ্রত্যয় সাহিত্যের ও চিন্তার ইতিহাসে আদৌ নূতন নয়, বস্তুত যেদিন থেকে ঈশ্বরের আবির্ভাব সেদিন থেকে যাত্রা শুরু নিরীশ্বরেরও। অতএব যদিও সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সংশয় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চিন্তার সাক্ষ্যে পরিণাম হতেও পারে যেমন হয়েছিল ম্যাথিউ আর্ণল্ডের

ছত্রে ('We are between two worlds, The one lost and the other powerless to be born,' আমরা আছি দুই জগতের মাঝখানে, একটি গেছে হারিয়ে, আরেকটির শক্তিই নেই জন্মাবার) তবুও কাব্যের ঈশ্বরসংশয় অথবা ঈশ্বরপ্রত্যয় কামনা গতানুগতিক দার্শনিক প্রত্যয়েচ্ছারই অংশ মাত্র। এমন ইচ্ছা ষোলো শতকে বা ষষ্ঠ শতকে বা প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় যুগেও প্রকাশিত হ'তে বাধা ছিল না, প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এমন কথা বলার কোনো প্রলাপী অভিপ্রায় আমার নেই যে কবিদের বিজ্ঞান সচেতন হতেই হবে। কবির বিশ্ববীক্ষায় কোন্‌ উপকরণটি হবে সৃজনস্রাবী সে কথা বলার ধৃষ্টতা থাকবে কোন্‌ সমালোচকের? আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সে-বিশ্ববীক্ষা যদি বিপর্যস্ত-প্রত্যয়ক্লিষ্ট হয়, তার অনুভূতিসঞ্চারক্ষমতাও হবে ক্ষীণ, তার শিল্পসিদ্ধি হবে অসম্পূর্ণ। আধুনিক ইওরোপীয় কাব্যের মস্ত অংশেই (বিশেষত আঠারো শতকোত্তর কাব্যে) এই অসম্পূর্ণ শিল্পসাধনা ও সিদ্ধির মোহর আঁকা। কবিগণ একদিকে ভেবেছেন যে পরম সত্য কাব্যেই নিহিত বিজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের সত্য ক্ষণস্থায়ী। এমন ভাবনার ফলে জড়-জগতের এলাকায় বিজ্ঞানের যে ক্রমেই বেড়ে-উঠতে-থাকা মহতী বিজয়যাত্রা তা' থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ল শিল্পীচিত্ত, কাব্যের জড়জাগতিক আবেষ্টনী ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'তে লাগল, শিল্পের বিষয়বস্তু বহির্জগৎ থেকে সরে' এসে আশ্রয় নিল শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় ও মানসিকতায় আর এই পিছু-হঠে-যাওয়া, ক্রমেই কোণ-ঠেসা সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে শিল্পের অঙ্গচালনাকে সমালোচকগণ মস্ত মস্ত নাম দিয়ে' ('সম্বিৎ প্রবাহ', 'মনস্তাত্ত্বিক শিল্প', 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ শিল্প' প্রভৃতি) পরিতৃপ্ত হলেন। এই সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও ঘটল। কবিরা শিল্পদর্শনে অগ্রাহ্য করলেন বিজ্ঞানকে কিন্তু ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে বিজ্ঞান সম্ভূত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সদ্ব্যবহারে কিছুমাত্র উদাসীন রইলেন না। এইভাবে টেক্‌নলজি স্বীকার হওয়ার ফলে প্রাচীন উপকথা, বীর্যগাথা, লোকপ্রত্যয়গুলি অবহেলিত হ'তে লাগল, কাব্যের বিষয়বস্তুর এলাকা এভাবেও সঙ্কীর্ণ হ'ল। কবিরা যতই বাইরের জগৎ ছেড়ে মনোজগতে প্রবেশ করতে লাগলেন, অব্‌জেক্‌টিভ্‌ শিল্প ছেড়ে সব্‌জেক্‌টিভ্‌ শিল্পের আশ্রয় নিলেন, ততই বাড়ল কাব্যের দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা। ডক্টর জন্‌সনের "রাসেলাস্‌" নামক গ্রন্থে ইম্‌লাক বলছেন যে কবির কর্তব্য বিশেষ গুণের বিচার নয় সাধারণ গুণের বিচার। এই সারবান্‌ ক্লাসিকপন্থী উপদেশ আধুনিক কবি (তথা শিল্পী) ভুলে গেছেন, তাঁর ধ্যেয় ভূমা নয়, ক্ষুদ্র আয়তন মাত্র। কবিরা নিজ নিজ সংবেদনার সঙ্কীর্ণ আয়তনের চারিদিকে দেয়াল তুলছেন, উঁচু থেকে আরো উঁচু হচ্ছে সে-দেয়াল। অথবা বলা যায়, কবিরা বাইরের জগৎ ছেড়ে নিজ নিজ চিত্তেই সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন। এই অপরিসীম আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে অনেক কবির বাক্‌প্রতিমায় এবং সংবেদনাপ্রবাহে সে-অসুস্থ বিকারস্তিমিত মানসিকতা যা' দস্তয়েভস্কির "নোট্‌স্‌ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড" অথবা কাফ্‌কার কাহিনীগুলিতে প্রকট। আর এ-কারণে আজকের সমাজ থেকে কাব্যের সর্বজনগ্রাহ্যতা লোপ পেয়ে গেছে। কাব্য বা কবির নামে আমরা গদ্‌গদ বচন কিন্তু বেশ দূরে দাঁড়িয়ে। যদিও বা কিছু কাব্য কিছু উপন্যাস পড়ি, তা'র মধ্যে আবার উঁচুকপালে, মাঝকপালে, নিচুকপালে প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ মেনে চলি।

এই ক্লেশকর ক্লান্তিকর অবস্থা থেকে, কাব্যশক্তির ক্রমক্ষীণতা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে কবিকে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের সত্যে ও শিল্পের সত্যে কোনো বৈরিতা সম্ভব নয়, প্রাক্‌-রেনেশাঁস যুগে ছিল না, এখনো থাকা স্বাভাবিক নয়। কীভাবে এই আপাতবৈরিতা অপসৃত

হবে সে কথা হয়তো কবি শুরুতে বলতে পারবেন না কেননা দ্রুতধাবমান যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিজ্ঞানসম্ভূত প্রত্যক্ষ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আর সাধারণ মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতি কী ভাবে পরস্পরে মানানসই হবে, মিলে' মিশে' এক হবে সে-সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব মূলতঃ দার্শনিকের। হয়তো বর্ট্রাণ্ড রসেল্‌ ও হোয়াইটহেড্‌-এর প্রয়াসেও বিজ্ঞান ও শিল্পী সাযুজ্যলাভ করেনি, হয়তো করবে আগামী দার্শনিকের চিন্তায়। মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতির সুসংগতিসাধন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে, সে-কাজও কবির নয় সমাজবিদের। কিন্তু কবি অন্তত এই প্রত্যয়সম্পন্ন হবেন যে জীবনের বিচিত্র বিশাল এলাকায়, আপাতবিরোধের গভীরে ঐক্য বিদ্যমান, বিজ্ঞানে ও শিল্পে, কল্পনায় ও কর্মে, জ্ঞানে ও স্বজ্ঞায়, নীতিতে ও অনুভূতিতে একই জীবন-মহাদেবের নৃত্য। যাকে বিরোধ মনে করা যায়, সে আসলে অহ্রিমান ও অহুর-মাজ্‌দার নিরন্তর সংগ্রামশীল লীলাছন্দ। কবির জগৎ অখণ্ড জগৎ।

নদ ও কড়ি

সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যেখানে বাজারের সদর পথ ঘেঁসাঘেঁসি দোকানগুলোর মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে এসে একটু পরিসর হয়ে, ডাইনে ঘুরে, তারপর হঠাৎ ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে ঘাটের দিকে, সেই মোড় নেওয়ার ঠিক মুখেতে মুকুন্দ কাঁসারির ঝালাই মেরামতির দোকান ঘর। রাস্তার দুধারে বাড়ীগুলো দেখে মনে হয় একটা টানা দেয়াল থেকে ভাগ ভাগ করে আলাদা করা। চুনকাম করা দেয়ালে বড় বড় আলকাৎরার পোঁচ টেনে লেখা নম্বর জানায় শুধু পৃথক ঠিকানাগুলো। তারই খুব সংকীর্ণ একটা ভাগে উঁচু ভিতের উপর ছোট একখানা দোকান ঘর, টানা দেয়ালের গায় টোল খাওয়া গর্তের মত মাত্র। তিনভাঁজ করা সেকেলে আলকাৎরা মাখানো কবাটের মাথায় টুকরো টিনের সাইনবোর্ড দোকানের পরিচয় ঘোষণা করে। কিন্তু অনেক বছরের ধুলো রোদ বৃষ্টি লেগে লেগে লেখাগুলোর কোন চিহ্নই আর সেখানে নেই। তার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি বহুকাল।

প্রত্যহ অগণিত মানুষ ঘাটে স্নান সেরে কেউ ঘটি গঙ্গাজল হাতে, কেউ বাজারের থলি হাতে কেউ বা নাতিপুতি কাঁখে কোলে নিয়ে ভিজে কাপড়ে জল ঝরাতে ঝরাতে ফেরার সময় দেখে মুকুন্দ তার ছোট চুলীর মাথায় গুঁড়ো কয়লা চাপিয়ে হাপর ঠেলে হাওয়া দিচ্ছে একমনে। তার সাদা চুলভর্তি মাথা দু হাঁটুর মাঝখানে ঝুঁকে পড়েছে, কপালের প্রান্তে ঘন সাদা কাশফুলের মত ভুরুজোড়া কুঁচকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রয়েছে চুলীর আগুনের দিকে। পাশে জড়ো করে রাখা পুরনো ঘড়া ঘটি বাটি থালা গেলাস,—আরও কতশত আকারের বাসনপত্র। অন্যপাশে ঝালাই করার সাজ সরঞ্জাম,—রাং, তামা পিতলের কুচি, হাতুড়ি কাঁচি ছুরী বাটালি, নানা জিনিস। ভিতরে অন্ধকার কোণে একটা তালা দেওয়া মাঝারি জারুল কাঠের বাক্স। পাশে গুটিয়ে রাখা ময়লা বিছানা মাদুর, ছোট তোলা উনুন, একটা মাটির হাঁড়ি—এই সর্বস্ব। দেয়ালে ঝোলানো মাকড়সার জালে ঢাকা কবেকার এক-খানা ক্যালেণ্ডার, তার বিবর্ণ ছবি ধুলোয় চাপা পড়ে থাকে।

শ্রীধাম নগরে মানুষ বিস্তর। তাছাড়া তীর্থযাত্রীর ভীড় বারোমাস। আর উৎসবে-মহোৎসবে ভীড়টা ফেঁপে আসে পূর্ণিমার জোয়ারের মত। অন্য সময় থিতিয়ে থাকে। অনতিদূরে ঘাট থেকে আসে ফেরী নৌকোর মাঝিদের যাত্রী ডাকাডাকি, স্নানার্থিদের কথা-বার্তার স্বর, মাল বোঝাই গরুর গাড়ী পার করার হট্টগোল। গা-ঝরানো জল ফেলে ফেলে পথটার মাটি সবসময় চকচক করে। পুজোর ফুল পড়ে থাকে দু একটা। আর কানে অনর্গল কল থেকে জল পড়ার মত ঢোকে অসমাপ্ত কথার টুকরো, হাসি গল্প বকুনি ওজর ভর্ৎসনা কান্না অভিমান। কিন্তু মুকুন্দ মাথা তোলে না সাধারণতঃ। অনেক বছর শব্দের এই সংমিশ্রিত প্রগল্‌ভ সুরের সঙ্গে তার কান বাঁধা হয়ে আছে। সে শোনে কিন্তু কান পাতে না কোনদিন।

রকমারী লোক রকমারী ফরমাইশ নিয়ে আসে মুকুন্দের দোকানে। কেউ ঘটি ঘড়া থালা নিয়ে আসে মেরামত করাতে, কেউ আবার টিনের বা এ্যালুমিনিয়ামের জিনিস আনে। মুকুন্দ কোনটা রাখে কোনটা বা ফেরৎ দেয়। কখনো কাজ থেকে সে মুখ তুলতে চায় না,

কখনো গল্প করে সারাবেলা।

আবার ছোট বয়সী-বয়সিনীদের ডাকাডাকিতে কোন সময় মুকুন্দ অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, —র— তদের আজ দেখাইমু, আইজ আর একটারেও ছাড়ুম না!—চারিদিকে জলতরঙ্গের মত হাসির খিলখিল শব্দ বেজে ওঠে। মুকুন্দও যোগ দেয় সে হাসিতে, ফোকলা মাড়ি দুটো বেরিয়ে দুচোখের গালের চামড়া অসংখ্য কোঁচকানো রেখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে একটা ছেলেমী যেটার জন্যে তারা অপেক্ষা করে ছিল।

একদিন তেমনি কানে অবিরত এসে ঢোকে,—মুকুন্দদা—অ মুকুন্দদা, একবার চাওনা, একবার তাকাও না—। মুকুন্দ মুখ তুলে চেয়েছিল। দোকানের উঁচু মেঝের কানায় থুতনি রেখে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল একটি কিশোরী। দুটো ছোট ছোট মুঠিতে ধরা হাতের বালা ঝনকাঠের উপরে পড়ে থাকে। মুকুন্দর ঘন ধপধপে সাদা ভ্রূ জোড়ার নীচে দৃষ্টি একমনে কিছুক্ষণ দেখতে লাগল বালা দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে, তার চোখদুটো একটু একটু করে নেমে এসে দাঁড়াল বালাজোড়ার অধিকারিণীর মুখের উপরে।

—ওগুলা আনিস্‌ ক্যান? আমি কি স্যাক্‌রা যে কামিনীদের অলঙ্কার ম্যারামত করুম!

—আহা হা, মুকুন্দদা যেন জিনিস আর চেনে না, এটা কি সোনার যে স্যাকরার দোরে যাব—

—সোনার লয়?—মুকুন্দর চোখদুটোয় ঝিকিয়ে উঠল হঠাৎ একটা দুষ্টমীভরা হাসি,—আহা অমন সোনার হাতটায় তা হইলে কি পিতল ধইর্‍যা রাখছ! দ্যাও দেখি—

কারুকার্য করা বালা দুটো হাতে করে মুকুন্দ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। দু হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঝুঁকতে ঝুঁকতে নেমে আসে হাতটার একবারে সন্নিকটে, সাদা উঁচু উঁচু ভ্রূর আড়ালে চোখ দুটো ঢাকা পড়ে যায়। সস্তার পিতলের বালা কিন্তু কারুকার্য স্যাকরাদের হাতের মতই পরিপাটি। হয়ত সোনার জল দিয়ে উজ্জ্বল করা ছিল কিনবার সময়, কিন্তু এখন ময়লা পড়ে হলদেটে হয়ে আছে। দুটো বালারই জোড় খুলে গিয়েছিল। মুকুন্দ হাপর দুবার ওঠা নামা করিয়ে তাতালটা ঠেলে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর বালাজোড়া নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

—কত পয়সা নেবা?—আলতায় রাঙানো একটা নখের মাথা দিয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল কিশোরী।

মুকুন্দ হাপরের উপর থেকে হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল। তার দ্বিসপ্ততি বর্ষের প্রাচীন রেখা টানাটানা গম্ভীর মুখের মধ্যে কেবল চোখ দুটোর কোলে যেন ভাদ্রের রোদ-ছায়া খেলা করে বেড়ায়। অদ্ভুত যৌবনভরা চপলতা চিকমিক করে ওঠে সুচের মত তীক্ষ্ন চোখের মণিদুটোয়।

—ইটার জন্য পির্‌থক্‌ মুজুরী লাগবে।

কিশোরী মুকুন্দর কথার ধাঁচ বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর চোখের দুরভিসন্ধি ভরা আলো দেখে বুঝতে পারে মুকুন্দ মনে মনে কি একটা অপ্রস্তুত করা কথা ফাঁদছে যার সঙ্গে মেরামতির মজুরির কোনো সম্বন্ধ হয়ত নেই।

ভুরু কুঁচকে খরখর করে ধমকে উঠল সে,—কি লাগবে না লাগবে বল তাড়াতাড়ি। তোমার দোরে আমি বেলা পোয়াতে এসেছি নাকি? দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

—এই লাও কথাটাগ! দুই দণ্ড বুড়ার সাথে কথা কইবার তর সয় না, হা—দোরে বুঝি তর ময়ূরপঙ্খী চইড়্যা রাজপুত্তুর আইসে?

—যাও!—দাও আমার বালাজোড় ফেরৎ! কেবল কেবল ভারী কথা শিখেছ!—কিশোরী রুষ্ট হয়ে চোখ জামের মত পাকিয়ে তাকাল।

—ক্যাবল ক্যাবল সোন্দর সোন্দর কথা বলবার জানে খালি বুড়াটা—!

মুকুন্দ আগুন থেকে তাতাল তুলে নিয়ে বোলাল দুবার নামিয়ে রেখে দেওয়া হাতের কাজটায়। তারপর আবার সেটা নামিয়ে রেখে একটা বালা তুলে নিয়ে জোড়ের মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলল,—বলি শুন্ কথাটা হরিমনি, তর দিদি তর বিয়ার উয্‌যুগ্ করে না ক্যান্ এ্যাদ্দিনেও? তর এমন রূপ—য্যান্ টগরের বাড়ন্ত কুড়ি থেইক্যা একটি একটি কইর‍্যা পাপ খুইল্যা আসত্যাছে, আর তা দেইখ্যা মানষের মন বুঝি ক্যামন ক্যামন করত্যাছে! দিদিরে ক, পাত্তর যদি না মেলে ত বুড়ারে ধরলে পর রাজী হব কি হব না!

—ধ্যেৎ!—কিশোরী এতক্ষণ নিবিড় কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল মুকুন্দর হাত বালাটায় কেমন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্ম কাজ বাঁচিয়ে বিন্দু বিন্দু গলান দস্তা ছুঁইয়ে ঝেলে দিচ্ছিল খুলে যাওয়া জোড়ের মুখটা। তার কানদুটো মুকুন্দর কথাবার্তায় যে খুব আপত্তি করে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল না। কিন্তু পাত্র হিসাবে মুকুন্দর অভিলাষ শুনে ফোঁস করে উঠল নেউলের মত।

—খবরদার! খারাপ খারাপ কথা বলবা না বলে দিচ্ছি!—একটু থেমে চোখে কুপিত কটাক্ষ হেনে—যা তার নবমীর সুডোল কচি বাঙ্গালী মুখখানিতে অদ্ভুত কৌতুকপ্রদ ভাব এনে দেয়—বললে,—আহা বুড়ো মানষের সখ ত কম নয়!

মুকুন্দ দুচোখ বড় বড় করে খুলে মণিদুটো পাশে ঘুরিয়ে বলল—তর মত রূপসীরে দেইখ্যা থির থাকে কার মনডা ক দেখি? কইস্ যদি, তর পিত্তলের বালাজোড়ায় এমন সোনার জল লাগায়ে দিমু—যে হাতডায় পরলে দেখাইব এক্কারে রানীর মত!

কিশোরীর চোখদুটো ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। মুকুন্দ যেটুকু বলে তার সহস্রগুণে সে দেখে মনের চোখে ফুটেতে—ময়লা নিষ্প্রভ বালা দুটো সত্যিই যদি সোনায় মুড়ে দেয়, সইতে না পেরে সে বলে উঠল সাগ্রহে—হ্যাঁ মুকুন্দদাদা, সোনার জল দিতে কত পয়সা নাগবে?

মুকুন্দ বালাটায় একটা শেষ কেরামতি করে নামিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো সত্যি সত্যি তার বিধুর দেখাচ্ছিল।—ওই যে কইলাম তরে, তর দিদিরে ক যাইয়্যা—

—যাঃ!—কিশোরীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আশাটা মনে মনে নিয়ে ফিরে গেল বালাদুটো মুকুন্দর কাছে রেখে দিয়ে, পরের দিন চাই বলে।

একটা পুরোনো কালচে রং নেওয়া মান্ধাতার কালের ঘটি হাতে তুলে নিয়ে তলায় ছিদ্র আবিষ্কার করার জন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল মুকুন্দ। চোখ দুটো প্রায় শতাব্দীর সিকি কম বছর এমনি পুরোনো বাসনের ফাটাচটা ছিদ্র ভাঙ্গা তোবড়ানো খুঁজে খুঁজে চেয়েছে। চোখ দুটো বাইরের কাজ করে। কিন্তু মনের ভিতর আরও কি ঘুরে বেড়ায় চোখের জিনিসগুলো পেরিয়ে কি সব অনামা দৃশ্যতে। কিম্বা নাম যে সবের হারিয়েছে, কিন্তু ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে থেকেছে। দু হাত ঠুং ঠুং করে পিতলের তামার চৌকো গোল পাত কেটে ছিদ্রের মুখে বসিয়ে ঝালাই করে যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা। চোখের রেখা

কাঁপে না, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ফাটলের দাগটুকু যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়। মুকুন্দ কিশোর বয়সে বাপের কাছ থেকে শিখেছিল কারিগরী। বাপ থালা বাসন গড়াত একটা গঞ্জের বাজারে। পুরোনো চালাচিত্তিরের মত ছবিটা যেন দেখা যায় স্থির হয়ে আছে। ধুলো পড়ে একটু ম্লান কোথাও। রাস্তার একপাশে সার বাঁধা গঞ্জের ব্যাপারীদের দোকান। অন্যধারে পাড় নেমেছে দোতলা সমান নীচে। দোকানে বসে চোখে পড়ত বড় বড় নৌকোর মাস্তুলে আটা নিশানা হাওয়ায় উড়তে উড়তে মন্থর বেগে এসে থামত দোকানের সামনে। লাল নীল সাদা হলদে কত রঙের পতাকা। আর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যেত যেখানে অনেক দূরে গাঙের বাঁক বিরাট প্রশস্ত হয়ে ঘুরেছে, ততদূর পাড় ধরে ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসা সার বাঁধা অসংখ্য বড় বড় মহাজনী বজরা আর গাঙুনার নৌকো, পানসি ডিঙি জেলে নৌকো। ছইয়ের পর ছই, খুঁটি পোঁতা জলে, যেন কালো কালো এক দণ্ডল জলচর জীব একসঙ্গে ভেসে উঠেছে চরে। আর নদীর বিরাট বুক এক প্রকাণ্ড হীরের উপত্যকার মত ঝক ঝক করে সূর্যকিরণ লেগে। পাল তুলে ভেসে যাওয়া একটা নৌকো দেখতে দেখতে ছোট হয়ে আসে দূরে। বিকেলের পড়ন্ত সোনায় মুড়ে যায়, তারপর আঁধারে ডুব দেয়। টিমটিমে আলো জ্বলে অনেক দূর থেকে। যেন শিশুর মত পিছনে চেয়ে থাকে, বিশাল নদীর মাতৃবক্ষে ভেসে চলে যেতে যেতে।

সারাদিন ঠুন্ ঠুন্ঠুন্। আর হাপরের একটানা শ্বাস ফেলা। মুকুন্দর বাবা অমনি দুহাটু ফাঁক করে হাপরে হাত রেখে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখত মেরামতি বাসন সারতে সারতে। তারপর মন্বন্তর আসে দেশে। বরাবর সমস্ত ছবিগুলো মুকুন্দর মনে এসে একাকার হয় এই ছবিতে। তখন তার বয়স পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু একা মন্বন্তর নয়, তার সঙ্গে এসেছিল দুর্যোগ। দেশ ছেড়ে মুকুন্দকে বেরোতে হল ভাগ্যের দিশা খুঁজতে। মাথায় একটা কাঠের বাক্সে উনুন, ছোট হাপর, তামা পিতলের কুচি, আর ঝালাইয়ের সাজ-সরঞ্জামগুলো ভরে—ঘাটি বাটি সারাবে—! তামা পিতলের হাঁড়ি হাতা খুন্তি গেলাস বাটি —সা-রা-বে—! কালহীন সুর হেঁকে হেঁকে অচেনা সহর বাজারের মধ্য দিয়ে অনেক পথ ঘুরে যেতে হয়েছিল। অনেক রাস্তার ধারে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত শরীরটা, বাক্স নামিয়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। কোথা থেকে কোথায় চলেছিল তা মনে আসেনি, পাঁচজনের সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছে। পায়ের ছাপ বছরের ধুলোয় পড়ে মিলিয়ে গেছে।

একদিন ধূলিম্লান ভ্রূ জোড়ার নীচে থেকে চাইতে চাইতে মুকুন্দ এসে ঢুকলো শ্রীধাম নগরে। একেবারে পশ্চিমে। তার মন বলল এখানেই থাক। অনেক বন্ধন, ঘরদোর স্ত্রী পুত্রাদি মন্বন্তরের ঢেউয়ে যেন কোন এক নির্বাক অন্ধকার তুলি টেনে মুছে নিয়ে গিয়েছিল। ছিল তবু কাঠের বাক্সটা, ঝালাই মেরামতির অন্তরগুলো, ছোট ছোট তামা পিতলের কুচি আর ট্যাঁকে গণ্ডা আষ্টেক নগদ পয়সা। এখানেই ঘরে ঘুরে তার পথটা ছোট গণ্ডীটুকুতে এসে যেন কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘাটের কাছাকাছি রাস্তা ধরে মানুষ যাতায়াত করে বারোমাস। মুকুন্দর দোকানে কাজ আনে অনেকে। সকাল থেকে রাত অবধি মেঝেয় বসে কাজ করে চলে, হাত দুটো আর দুচোখ নিজেদের তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে থাকে। এখানে একটা খুঁটিতে বেঁধেছে ভেলাখান। তবু বুকের মধ্যে কি যেন অসমাপ্ত থাকে। মুকুন্দ কাঁসারী কত সীমানা মুছে যেতে দেখেছে তার পদচিহ্নের পিছনে, কিন্তু নদীর সেই বিপুল দাগটা মোছে না, জেগে থাকে

বুকে, বয়ে চলে মানুষের চোখের আবিরল চাউনিতে। কখনো তার আভাষ স্পষ্ট মনে হয়। ছোট হাতুড়ি ঠোকা বন্ধ করে সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে। জোড়া জোড়া চোখ ঝনকাঠের সীমানার উপরে জেগে থেকে আস্তে আস্তে পেরিয়ে যায়। যেমন নদীর জল বয়ে যায়। এগিয়ে আসে, একবার ছোট একটা ঢেউয়ের ভাব তুলে আবার ভেসে যায়, চিরকালের মত। নতুন মুখগুলো আসে অনেক দেশ থেকে। আরও পশ্চিম থেকে, মাথায় হলুদ রঙের পেঁচানো পাগড়ি, লাঠি হাতে, গলায় কাঠের মালা, কানে মাকড়ি, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা জুতো। মেয়েদের গা ভর্তি রুপোর গহনা, একহাত রঙীন ঘোমটা টানা। পুরোনোগুলো থেকে যায়। রোজ গঙ্গার ঘাটে চান সেরে ফেরে সামনে দিয়ে। মুকুন্দর উঁচু পটেয় চৌস দিয়ে কেউ গল্প করে। মুকুন্দর কথা শুনতে ভালবাসে অনেকে। চিবুকের উপরে বাঁ হাতের আঙুল বোলাতে বোলাতে মুকুন্দ তাকায়। কথা বললে ওর উপর নীচের মাড়ির শূন্য উন্মুক্ত স্থানটা মেলে থাকে। দাঁতগুলো বেশীর ভাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দ কোনোদিন স্বীকার করে না যে সেগুলো স্বাভাবিক নিয়মে পড়ে গেছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খোয়া গেছে একটির পর একটি,—ভগবানের দেওয়া দাঁত থাইকতে বাঁধাতে যামু ক্যান্—? সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরে কেউ প্রসঙ্গটা তুললে। মুকুন্দর সকল উক্তি শেষে পৌঁছয় সেই মন্বন্তরের কথায়। সব সময় তা একটা প্রলয়কালীন ঘটনার মত ওর বর্ণনায় ফুটে ওঠে,—মানুষ হাজারে হাজারে দ্যাশ ছাইড়্যা বাইরাল। একডাও দানা কারও ঘরে নাই। মহাজনের গুদাম খালি। তারপর দুর্যোগ আইল—নদী ফাইপা উঠল অজগরের মত—সে তোমরা বুঝবার পারবা না—আর ঝড়। সে কি তুফান বইতে লাগল! ক দিন ক রাত ধইর‍্যা দ্যাশডার বুকের উপর দিয়া ভাসায়া লয়্যা গেল চারিধার—বড় বড় মহাজনী লৌকাগুলারে আছাড় মাইর‍্যা খান খান কইর‍্যা ফ্যালাইল—

কোনদিন স্পষ্টভাবে বলে না মুকুন্দ কোন বিশেষ ঘটনায় তার দাঁতগুলো অমনভাবে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর বর্ণনাতে এমন প্রাণবন্ত রূপ ফুটে উঠত যে শ্রোতাদের চোখে সত্য সত্য ধরা দিত একটা দুর্যোগ, ভয়াবহতা যার সীমাহীন। মুকুন্দ নিজেও ভুলে যেত। কারণ তার জীবনে একটা প্রলম্বিত সত্যের আকারে চিরকাল মেলা রয়েছে কোনো বিপুল দুর্ঘটনা। যেটা তার সমস্ত জীবনের মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বাইরে তার প্রত্যক্ষ রূপ কখনো প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বর্ণনা করতে গিয়ে সে নিজেও মুখর না হয়ে পারে না। সেই প্রলয়ের ছবিটায় সে যেন খুঁজে পেত একটা অন্তঃস্ফারিত রহস্য, তার অমোঘ শক্তির সর্বব্যাপকতাই সে বারেবারে উল্লেখ করতে চাইত।

দাঁতগুলো পড়ে যাওয়া, দেহের চামড়া একটু একটু করে কুঁচকে ওঠা, এককালের কর্মঠ পেশীগুলো হঠাৎ শিথিল হয়ে আসা, চুলগুলো দেখতে দেখতে ধপধপে সাদা হয়ে ওঠা,—এসব কিছুর মধ্যে, স্তব্ধ আর অপ্রতিহতভাবে সেই একই দুর্ঘটনার ইঙ্গিতে ফুটে ওঠে যা থেকে সে কোনোদিন পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেনি নিজেকে। এক দুর্নিবার অপরোক্ষ শক্তির ইন্দ্রজালে তা তার কোষে কোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, হরণ করে নেয় সামর্থকে। মুকুন্দ ডান হাতের বহু বছরের কাজ করা কড়াপড়া আঙুলগুলো মেলে হাতটা উল্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর একটা আঙুলে দিয়ে থুতনির উপরে ঘসে ঘসে ভিতরের দন্তহীন মাড়িটাকে অনুভব করে। আঙুলের শুকনো বাকলের মত রুক্ষ চামড়ায় থুতনির উপরে শিথিল ভিজে ভিজে মাংসের ছোঁওয়া একটা ক্লেদাক্ত বোধকে জাগিয়ে তোলে। সে আঙুলে নামিয়ে নেয়। কাটা কুমড়ো পচে উঠলে যেমন আঙুলে গলে যায়

তেমনি শরীরটা ত্যালতেলে হয়ে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। একটা দারুণ নিরাশা অন্ধকারের মত চোখে ঘিরে আসে। আবার চোখ দুটো হাঁতড়ে ফিরে চলে। মন্বন্তরের অনেক আগে টিনের একখানা চালা ঘরের ছবি ভেসে ওঠে চোখে। সামনে পথ, গঞ্জের হাটে ব্যাপারীরা হাঁকডাক করে মাল মোট তোলে নামায়, ঝাড়া পাড়ের গায় সারবাঁধা মানুষগুলো এ ওর মাথায় তুলে দেয় বস্তা। বড় বড় সওদাগরী নৌকোর খোলে ভর্তি হয় ধানচাল আরও কত সামগ্রী। সেখান থেকে দূরে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটির কোল ছুঁয়ে যায় নদীর ঢেউগুলো। বাসনার মত কি উদ্গ্র হয়ে ওঠে তার মর্মে। স্মৃতিকে যদি বওয়ানো যেত, চিরযৌবনা স্রোতবতী ধমনীতে তরুণ অনুরাগ ভরা স্পন্দনকে পুনঃ জাগিয়ে তুলত; শিথিল স্নায়ু শিরার ভাঁজে পেশীগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঢেলে দিতে পারত তার রস, অনন্তযৌবনা নদীর ভাব দিয়ে বাসনায় জরিয়ে দিতে পারত দেহের বৃন্তমূল, ইন্দ্রিয় ইচ্ছা সবকিছু। কথা বলতে গিয়ে মুকুন্দ নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে ওঠে, হাসির আওয়াজে এমন একটা সাহসী ঝংকার ফোটে যা জরা আর বার্ধক্যকে মনে করায় একটা ছদ্মবেশ, একটা প্রগাঢ় ছলনা।

মুকুন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে না কি ঘটে তার শ্বিসপ্ততি-বর্ষের প্রাচীন কাঠামোর ভিতরে। কখনো মনে হয় ব্যারামে ধরেছে। দ্রুত দেহটার তল থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ স্পষ্টভাবে তা ধরাও যায় না। গোপন থেকে রোগটা একটু একটু করে অধিকার করতে থাকে দেহের রাজ্যে। কলুগীতে একটা ধুলো পড়া কালীর পটের পিছনে রাখা থাকে একটা আরশি। সেটা পেড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে সে তেঁড়ি কাটত, পাকা চুলগুলো উপড়ে ফেলত। কিন্তু একবার দেখল সারা মুখে সেই অনির্দেশ্য ব্যাধি এত দ্রুত জিতে নিচ্ছে যে সে এঁটে উঠতে পারছে না। একদিন সে চমকে উঠল নিজের চোখের মণির দিকে তাকিয়ে। একেবারে ঝাপসা দেখাল, চারিপাশে একটা প্রভাহীন ঘোলাটে আস্তরণে ঢেকে গেছে। মনে হল কালকেও যেন দেখেছিল চোখ দুটোকে চকচক করতে, এক রাতে ম্লান করে দিয়েছে তার দীপ্তি। নাকি সে চোখে দেখছে কম। কিম্বা আরশিটার কাচে দোষ হয়েছে। কিছুদূরে একটা দোকানের ঝকঝকে বড় আয়নায় প্রতিফলিত হতে দেখে সে নিজের আকৃতিকে একদিন যখন ফিরছিল বাজার থেকে। সে তাকাতে লাগল নিজের চোখে। পিছনে কে রসিকতা করে বলে উঠেছিল,—বলি ও মুকুন্দখুড়ো, অত রূপের দিকে নজর দিলে খোয়া যাবে শেষটায়।...

—মুকুন্দদাদা পিসীর ঘড়াটা মেরামত করা হল নাকি?—গলার স্বর কানে পৌঁছতে মুখ তুলে তাকাল মুকুন্দ রাস্তার দিকে। চোখ দুটো হঠাৎ একরাশ অন্ধকার ঠেলে উঠে সহসা খুঁজে পায় না স্বরের অধিকারিণীকে।

—কে বিন্দা—ঘড়াটা কখন লয়্যা গেছে কালীদিদি, কাল বৈকালেই আসছিল না—

—ওমা তাই নাকি!—তা আমায় বলেও নি সে কথা। দেখ'ত মিছিমিছি বিরক্ত করতে এলাম।

—আহা বিরক্ত কয় কেডা—দরকার না থাইকলে বুঝি আসতে নাই একবারও—?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের মেঝেয় একটা হাত রেখে ঝুঁকে তাকিয়েছিল বৃন্দা। মুকুন্দ কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। চোখ দুটো কোনো একটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্টতা পায় না। তার মুখের রেখাগুলোয়

আস্তে আস্তে একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখটা। বৃন্দা বিশ বাইশ বছরের বিধবা যুবতী। সাদা থান পরা ঢালাই করা ঘড়ার মত মাজা পেটা গড়ন। ঘাট থেকে স্নান সেরে সদা উঠে এসেছিল, কপালে নাকে শ্বেত চন্দনের রসকলি চিহ্ন আঁকা, ভিজে চুল থেকে জলের ফোটা গড়িয়ে এসে শিশিরের মত ফুটে উঠেছিল মুখের কোমল পাতায়। মুকুন্দর মুগ্ধ অস্পষ্ট চাউনিতে মনে হয় সে মুখ সদা ফোটা ফুন্দের মত। আর্দ্র বস্ত্রের ঘনিষ্ঠতায় অটুট যৌবন রেখার পুঞ্জিত লীলাভঙ্গী ফুটে উঠেছিল স্তবকে স্তবকে।

—ওটা কি হাতে করে বসে আছ মুকুন্দদা—

—এডা?—মুকুন্দ মুখ নামিয়ে তাকাল হাতে করা জিনিসটার দিকে। একটা অপ্রস্তুত সলজ্জভাবের কৈশোর নবীনতা ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে।—এডা পিত্তলের কঙ্কন একডা, দিয়া গেসিল ওই হরিমণি বইলা ছুঁড়িটা,—কয় তুমি তামা পিতল ঝালাই কর। এডা পিতলের কিনা, সাইরা দ্যাও—!

—ও তাই বুঝি—তুমি বুঝি গয়নাও মেরামত কর মুকুন্দদা—? অধরোষ্ঠ দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে কটাক্ষ হেনে তাকাল বৃন্দা। তার সে দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গে মুকুন্দর বার্ধক্য জীর্ণ শরীরের তলায় কি যেন গ্রীষ্মকালে শুকনো ঘাসের প্রান্তরে লাগা অগ্নিরেখায় জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলতে পারে না, বলে—

—পিতলের এডা।

—আমায় কেমন মানাবে পরলে মুকুন্দদা?—নিঃসঙ্কোচে একটা নিরাভরণ হাত বাড়িয়ে ধরল বৃন্দা। মুকুন্দর দুচোখ এগিয়ে আসে পুজারীর মত। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে একখানা বালা নিয়ে বাঁহাতে সে বৃন্দার প্রসারিত হাতের আঙ্গুলগুলো ধরতে গেল। মুহূর্তে হাতটা সাপের জিভের মত টেনে নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল বৃন্দা—

—আমি না বিধবা—গয়না পরতে আছে নাকি!

মুকুন্দর অস্পষ্ট দৃষ্টি যেন দেখতে লাগল একরাশ উল্লসিত মুক্তার নির্ঝরকে। কোমল চন্দন লেপা কপালে একটা ফাটকের মত জলবিন্দু কাঁপছিল—তারপর গড়িয়ে পড়ল ঘনকৃষ্ণ চোখের পল্লবে। চোখের একটা পাতা নেমে এসে হাসির ধারা হঠাৎ থেমে গেল।

—বিধবা মানুষের গয়না গায় পরতে নেই যে মুকুন্দদা।

মুকুন্দ বুঝতে পারল না কথার মানে পুরোপুরি বৃন্দার চোখের দিকে চেয়ে থেকে। কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের অনেক আড়াল দিয়ে বিদ্যুতের আনাগোনার মত বৃন্দার চোখ দুটোয় কখনো আনন্দ-বিষাদ কখনো দুরধিগম্য মর্মের ইসারা কাঁপছিল প্রজাপতি ডানায়। মুকুন্দর অভ্যন্তরে যেন বন্ধ ঘরের পর ঘর পেরিয়ে পদশব্দ এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনই তা নিকটতম হয় না।

সে বালাটা নামিয়ে রেখে বলল,—তরে বিধবা করল কেডা—সেই বিধাতারে একবার জিগাই এমন সোনার মনিবন্ধ গড়তে গেলা ক্যান যদি অলঙ্কার পরণে বাদ সাধবার মন আছিল?

বৃন্দার মুখে একটা ছায়া এসে পড়ল। মুকুন্দর মনে হয় বৃন্দার চোখ দুটো প্রতিমার চোখের মত চেয়ে থাকে, চঞ্চলতাবিহীন ভাবে।

—কতদিন সোয়ামী গ্যাছে?—প্রশ্ন করে মুকুন্দ।

—সে অনেক বছর,—অন্যমনস্ক ভাব কাটিয়ে জবাব দিল বৃন্দা,—আট ন' বছর হতে চলল।—

—কি হইছিল?

—কি এক ব্যামোয় ধরেছিল ডাক্তার ধরতে পারল না। সাতদিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে থেকে শেষরাতে মারা গিয়েছিল। আমি তখন বারো বছরের মেয়ে।—

বৃন্দার মুখ থেকে বিষণ্ণতার ভাব সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে যায়। চোখ দুটোয় চপলতা ফুটে ওঠে। আবার আগের মত কৌতুকমেশা চটুল গলায় বলল,

—মুকুন্দদাদা তীর্থে এসে এতকাল রইলে, ঘরসংসার কোথায় রেখে এসেছো—কোনদিন ত বল না?

মুকুন্দ হঠাৎ বড় বড় চোখ করে চাইল,—শোন্ মাইয়্যাডার কথা! সংসার আবার রাইখ্যা আসব কোনখানে? তোমাগো সাথে সংসার পাতুম বইলাই না শ্রীধামে আসছি!

—না গো না!—তীক্ষ্ণ সুরে বেজে ওঠা গলায় বাধা দিয়ে বলল বৃন্দা—জিগ্যেস করছিলাম তোমার দেশে পরিবার ছিল যে, সে পরিবার কোথায় রেখে এসেছো?

—রাধারাণীর পায়!—কেমন একধরনের অদ্ভুত মধুর হেসে তাকাল মুকুন্দ,—তারা রাধারাণীর সংসারে আছে।

বৃন্দা কথাটার অর্থ আঁচ করতে না পেরে ভুরু কুঁচকে চাইল। মুকুন্দর মনের প্রান্তে সেই দুর্ঘটনা দূরে ভাঙ্গা বাড়ীর মত জেগে ওঠে। তার দৃষ্টিশক্তি প্রতিমুহূর্তেই ক্ষীণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে মনে হয় চোখ ফেরাতে পারে না সে এক জল থেকে যার বুকে তিমির দ্রবীভূত। তার সমস্ত ইচ্ছাকে ফিরিয়ে এনে জড়ো করবার চেষ্টা করল সে বৃন্দার চন্দ্রকলার মত মুখচ্ছবিতে।

বৃন্দার হাসি তাকে উদ্ধার করল,—তুমি কেমনধারা সংসারী মুকুন্দদা! দিয়ে ফেলে আবার নতুন করে চাইতে আছে নাকি?

মুকুন্দর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ক্যান লমুনা! পুরোনডারে দিয়া দিয়া বুঝি আর নুতন কইর‍্যা মাগ্‌তে নাই? পুরান যা তাই ত নুতন কইর‍্যা ফিরা‍্য আসে বার বার—

নিশিদিন মনের পিছনে একতারার মত একটা সুর বাজে। যে নদী অনন্ত যৌবন-প্রবাহে বয়ে চলে তার ফল্গুধারা শিরার মধ্যে চঞ্চল হয়ে আসে। বৃন্দার মুখে যেন অব্যক্ত কথা ফুটে থাকে, হাসির পিছনে মরীচিকার মত থেকে থেকে আবার হারিয়ে যায়। তবু মুকুন্দ চোখ সরাতে পারে না।

—ওমা, তা সখ তোমার ত খুব মুকুন্দদা—!

বৃন্দা কৌতুক ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সাদা ভ্রূর নীচে থেকে মুকুন্দর চোখ দুটো পাথরের মত ঝকমক করছিল। মুখের রেখায় ভরে উঠেছিল একটা যৌবনস্মৃতি, অনুরাগের হাসি প্রাচীন শীর্ণ ঠোঁট দুটোর নিরনুভূতিতে কোমলতা এঁকে দিয়েছিল।

পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত লোক চলে। খেয়া ধরতে ছোটে কতক লোক। স্নান সেরে ঘাট থেকে ফিরে আসে আরও অনেকে। পায়ের শব্দ কথাবার্তার গুঞ্জন, কাছের আওয়াজ আর দূরের আওয়াজে মুখরিত প্রতিদিনকার দিনমান অব্যাহত বয়ে চলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা কনুই দোকানের মেঝেয় ভর করে রেখে মাথাটা আলতো ভাবে হেলিয়ে ধরে থাকে বৃন্দা হাতের তালুতে। কপালে শুকিয়ে যাওয়া চন্দনের ছাপগুলো আবার ভিজে উঠেছিল ঘামে। গায়ের ভিজে একহারা থানটা গায়ই শুকিয়ে এসেছিল। একজন মালাকার চুপড়িতে কলাপাতা চাপা দেওয়া সদ্য তোলা ফুল নিয়ে যাচ্ছিল।—চাঁপা গন্ধরাজ টগর

দোপাটি গাঁদার মালা কয়েক গোছা। ঝুড়িটা হাতে নাচাতে নাচাতে হনহন করে সে গেল গিরিধারী জীউর মঠের গলিতে মালা বেচতে। যাত্রীরা মালা কিনে দেয় বিগ্রহে। বৃন্দার হঠাৎ ইচ্ছা করল একটা মালা চেয়ে হাত ধরে থাকতে। কিম্বা আপন গলায় পরতে। কেন এমন ইচ্ছা এল মনে সে জানে না। হয়ত ফুলগুলোর গা ছোঁওয়া বাতাসে একটা কিসের স্মৃতি নিয়ে আসে যা কোনদিন জীবনে ইতিপূর্বে ঘটেনি।

মুকুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সে দেখতে পায় তার অসম্ভব জরাভার দেহটা। হাঁটুর মাঝখানে মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করছিল মুকুন্দ। পিঠটা বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিল, বিশীর্ণ কণ্ঠার হাড়ের দুপাশে থলির মত ঝুলে থাকে গলার লোল চামড়া।

—বৃন্দা, তর মুখের দিকে চাইয়া থাইক্যা আমার ক্যামন মনডা হয় জানস্? ঠিক রাধারাণীরে য্যান আমি দ্যাখতে পাই সমুখে।

বৃন্দা চমকে উঠল। কানে ঢোকে কী প্রগাঢ় স্বর। সামনের কালহীন বয়সী বার্ধক্যের মূর্তি যেন বস্তুত্ব হারিয়ে মিশে যায় আশেপাশে বিক্ষিপ্ত দ্রব্যগুলোর মধ্যে। পুরোনো টোল খাওয়া কলঙ্ক ধরা প্রভাহারানো ঘটি ঘড়া থালা গেলাস। রাস্তায় উজিয়ে আসা মুখের পর মুখ চোখের কানা দিয়ে ভেসে যায়। বৃন্দা মাত্র একটা স্বরের উপস্থিতি টের পায়। সুপ্ত কোন এক গুহায় বিনাঘাতে প্রতিধ্বনি উঠে ফিরে আসে। আর সব কিছু ছিটিয়ে থাকে আলো অন্ধকারে ভাগাভাগি হয়ে। কতকগুলো স্বপ্নের ছাঁচের মত। কিন্তু স্বরটা তার বুকে খঞ্জনীর মত বাজতে থাকে মৃদু রিন্ রিন্ ঝঙ্কারে। কোথা থেকে প্রবাহিত হয় এই ধ্বনি। তার মর্মগুহায় অব্যক্ত ধ্বনিদের বন্ধন মোচন করে সুগভীর স্বপনে ভরিয়ে দেয় তার কখনও সাড়া-না-জাগা অনাদিকালের যুবতীহৃদয়কে। ঘাটের পথ ধরে চলা মানুষদের চোখ লক্ষ্য করে না মুকুন্দ আর বৃন্দাকে। বা অনুভব করতে পারে না বৃন্দার মনের কোন ভাব বিদেহী হয়ে জড়িয়ে যায় মুকুন্দর কণ্ঠনিঃসৃত সেই আওয়াজে।

—আসি তা'লে মুকুন্দদা, ওমা বেলা কত বেড়ে উঠল বল দিকি! পিসী গালি পাড়বে। আমি বলব মুকুন্দ দাদা আমায় আসতে দেয় নি।

মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বৃন্দার চোখের কষ্টি কালো মণি দুটো টলে পড়ল চোখের সীমাকোণে, ঠোঁটে এক ঝলক হাসি কিসের একটা স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করে। মুকুন্দর মনে হয় সে যেন দেখতে পায় একটা দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে।

—আবার আসিস্ বিন্দে, বলল সে। বৃন্দা একবার ফিরে দেখল। দুচোখে কি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে উঠল, কিন্তু ততদূর মুকুন্দর ক্ষীণদৃষ্টি দেখতে পেল না।

কালী বোষ্টুমী পা ছড়িয়ে কোলে একটা কুলোয় করা চাট্টি খুদ বাছছিল আর হেঁট মাথায় বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছিলো। ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল ঢাকা মাথাটা থেকে থেকে ঝুঁকে নেমে আসছিল কুলোর উপর। কালী তখন মুখ তুলে তাকায় ছোট উঠোনটা পেরিয়ে খিল খোলা দরজার দিকে। চোখ দুটো তার সর্বদা পুরো খুলে থাকে, যেন কোন একটা অসহ্য আবেগে সে দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আর স্বাভাবিক স্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হয় নি। একটা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে ঠিকরে চেয়ে থেকেছে তারপর থেকে। বাইরে থেকে দেখায় তা দুটো খোপ থেকে বেরিয়ে আসা ভাঁটার মত, লাল ছড় টানা টানা ঘোলা ঘোলা। চোখ জোড়া মনে হয় জ্যোতিহীন, কিন্তু অল্প খয়েরী

মণি দুটোর দিকে সোজা তাকালে সে ধারণা মুছে যায়। মণি দুটো এক অসহ্য তীব্রতায় সব সময় জ্বলে। সেই জ্বলায় কোন মায়া মোহ অনুরাগ আসক্তি আনন্দ দুঃখের ভাবান্দোলিত বৈচিত্র্য নেই। তা সব সময় রুক্ষ গ্রীষ্মের আকাশের মত নিস্পন্দ প্রদাহে মেলে আছে, ছাঁচে ঢালা তীব্র স্নায়বিক অভিব্যক্তিতে। যদি কোন মনের আবেগ সেখানে দেখা দেয় তা হল একটা ঢালাও বিদ্বেষের। সেই সদা বিস্ফারিত চোখজোড়ার উপর থেকে উঠেছে অত্যন্ত বড় মসৃণ কালো কপাল। সরু রগের নীচে দুটো ভারী ভারী গাল ঝুলে পড়েছে ঢিবি থুত্নীর দুপাশে। পুরু উপর ঠোঁটে একটা প্রকাণ্ড ডুমো আঁচিল, স্থূল চ্যাপ্টা নাক মুখ ভোঁতা কুকুরের মত ঝুঁকে থেকে থেকে এক এক সময় হঠাৎ স্ফুরিত হয়ে ওঠে। নাকের উপরিভাগ ভ্রূ-সংযোগের কাছটায় একেবারে বসে গেছে, সেখানে কালসিটের মত দাগ চক চক করে। সামান্য উত্তেজনা পেলেই ভুরুদুটো কুঁকড়ে উঠে জুড়ে যায়, আরক্ত দুচোখ ঘেঁসাঘেঁসি এসে ধক ধক করে ওঠে।

কিন্তু খুদ বাছবার সময় কালীর মুখটা বড় বেশী নামানো থাকে। কেবল চোখে পড়ছিল পিঠের কুঁজটা গোল হয়ে উঁচু হয়ে থাকতে।

খুদ থেকে কাঁকর বাছছিল কালী। যত কাঁকর তত খুদ। গেরস্ত বাড়ীগুলোয় হরেকেষ্ট বোল দিয়ে গিয়ে খিড়কিতে দাঁড়ালে দেয় মুঠি ভর। পলস্তরা হীন দেয়ালে একটা কাঠের গোঁজ থেকে ঝোলান ভিক্ষের ঝুলিটা কালীর। গায় একই পেরেকে ঝোলান নাম জপের থলি। আর একটা গাবকাঠের লাঠি। আজকাল লাঠি বিনা চলতে কষ্ট হয় কালীর, কোমরে পিঠে বাতে ধরেছে। শিরদাঁড়া তাই সোজা করতে পারে না, সামনে একটু ঝুঁকে চলতে হয় ফালা বঁটির মত। আটচল্লিশ বছর এই সহরের পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরেছে কালী বোষ্টুমী। কড়ি কাঠে ঝুলে থাকে পেঁচানো দড়ির শিকায় ধুলোপড়া বহু প্রাচীন একটা খালি হাঁড়ি। বড় বড় মাকড়সা দেয়ালের গা থেকে চেয়ে থাকে। পুরোনো কাপড়ে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে ভিক্ষের ঝুলি তৈরী করত কালী। পাড়ে কৃষ্ণের শতনাম তুলত। বংশীধারী কেষ্ট রাধিকের একবার একটা যুগল মূর্তি সূচ দিয়ে তুলেছিল গায়। আবার যেখানটা ছিঁড়ে যেত সেখানে তাঁতিদের রঙের সুতো দিয়ে বাহার করে মেরামত করত। এক একটা ঝোলা চলেছে বিশ বছর। একবার একটা ঝোলা সে দিয়েছিল ব্রজগোসাঁইতলার কিরণ বোষ্টুমীকে।—বাবা, ভিক্ষে দাও গো—হরে কেষ্ট।—কালী খঞ্জনী বাজিয়ে কীর্তন গেয়ে ভিক্ষে করবার চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণের শতেক পদ তার জানা ছিল। কিন্তু গলায় এমন একটা রুক্ষ অকরুণ সুর তার ছিল ছোট থেকেই যে পদাবলীর আবেগ কিছুতেই ফুটত না, গাইলেই মনে হত খ্যার খ্যার করে ঝগড়া করছে। এমনিতেই দেশসুদ্ধ লোক তাকে পাড়া কুঁদুলী বলে জানে। কেউ ঘাঁটায় না। কালী বোষ্টুমী ভাল কথা বললে গলার কর্কশতাহেতু শোনায় যেন গালি। কাঁদলে মনে হয় দুষছে প্রাণ খুলে। গান গাইলে তা শোনাত আর্তনাদের মত। তাই সে অনেক বছর ধরে শুধুমাত্র একটি শব্দ আবৃত্তি করে। কি জানি হয়ত বছরের পর বছর হৃদয়ের ধারায় সিঞ্চিত হয়ে হয়ে গলাটা মাত্র ঐ ডাকটার সময়ই একটু দ্রব হয়ে যায়, যখন কালী দরজার ঝনকাঠে একটা হাত রেখে ডাক দেয়,—হরে কেষ্ট!

খুদগুলোর মধ্যে একটি একটি করে কাঁকর বেছে তুলতে তুলতে কালী বকে যাচ্ছিল আপন খেয়ালে,—মর্ আবাগের বেটা বিটিরা, তোদের স্বামী পুত্তুর দিয়েছে হরি—দুচারটে আস্ত চালও চোখের কোল গলে পড়ে না তোদের কুলো ঝাড়তে গিয়ে! অন্ধ হয়ে

যাবি তোরা—সাগর শুকিয়ে যাবে তোদের দিষ্টিতে নইলে অভাগীকে কেবল চালঝাড়া খুদগুলো দিয়ে এলি জীবন ভোর,—আর ও মুখপোড়া দেবতা—তুমিও দেখতে পাওনা—অভাগীর চোখের দিষ্টিটে অবধি হরে নিলে গো—বুড়ো মানুষ কাঁকর দেখে কি করে বল দিকিন!

থেকে থেকে মুখ তুলে আবার তাকায়। ছোট উঠোনের এক পাশে তুলসী মঞ্চের ছায়া পড়েছিল গোবর নিকোনো মাটিতে। পাঁচিলে বসে একটা কাক এক চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ্য করছিল তাকে। হঠাৎ কালীর অন্তরে একটা রোষ ক্ষুব্ধ হয়ে উপচে উঠল।—আর সে হারামজাদীর দেখা নেই! মর্ ঘাটে গেছে ত গেছেই!—এসে ভিক্ষেয় বেরুতে হবে—এধারে বেলা উঠলো যে শেয়রে, কোন গেরস্ত ভিক্ষে দেবে দুকুর বেলা? ঝাঁটা মারব হারামজাদীকে—মুখ থেঁৎলে দোব দুপা দিয়ে মাড়িয়ে! বুড়ো মানুষকে দগ্ধে খেলো ছুঁড়ী।

কাকটার দিকে রোষ কষায়িত দৃষ্টি মেলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল কালী বোষ্টুমী। যেন ছদ্মবেশে কোন মানুষ এসেছে তার অভিযোগগুলো শুনতে। যতই চেঁচাতে থাকে ততই তার ভিতরে পুঞ্জিত বিদ্বেষ ঘৃণা আহত বেদনা অভিযোগ আর অভিমানের উৎসমুখ খুলে যায়।—শোনো—ও তোমরা পাড়ার নোকেরা—কি করে জ্বালা দেয় হারামজাদী—বুড়ো মানুষকে ভাগা দিয়ে বিলোয় আর পোড়ার মুখো দেবতা তাকায় না একবারও। দেখো, সে—বারো ভাতারী ছুঁড়ি ভাতার কুড়িয়ে বেড়ায় রেতে দিনে—আর পিসী—ভিক্ষে করে খুদ কুড়িয়ে রেঁধে গেলায় হারামজাদীকে—গলাটা শেষ সপ্তকে উঠে হঠাৎ খরখর করে ভেঙে পড়ল এমনভাবে যা অপেক্ষাকৃত মানবীয় গলায় শোনাত হয়ত কান্নার মত, কিন্তু কালী বোষ্টুমীর বিভৎস ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে যে আওয়াজ বেরোয় তা কোনো বিকলাঙ্গ পশুর ডাকের মত তীক্ষ্ণ!—

—কি পিসী অত সোরগোল করছ ক্যানে—? দরজা ঠেলে মুখে সকাল বেলার সেই হাসির অপভ্রংশ লেগে থাকা প্রফুল্লতা নিয়ে এসে ঢুকলো বৃন্দা। মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো পিঠে ফেলে এগিয়ে গেল সে পাতকুয়োর ধারে। সকালে তুলে রেখে যাওয়া এক-ঘটি জল পায়ে ঢেলে উঠে এসে প্রথমে গঙ্গাজলের ঘটিটা নামিয়ে রাখল বারান্দার কোণে। তারপর কাঁধ থেকে গামছাটা রশিতে মেলে দিয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধা মোড়োকের গিঁট নিবিষ্ট মনে ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। একটা ছেঁড়া পদ্মপাতায় মোড়া ছিল দুটো বাতাসা, এককুচো নারকেল, দুটো কাঠমল্লিকে আর দোপাটি ফুল। কালী বোষ্টুমী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মুখ উঁচু করে থেকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল বৃন্দার প্রত্যেক গতিবিধি। ভ্রূ দুটো স্থির হয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার তন্ময়তায় ভরে থাকে। বৃন্দা মোড়োকটা হাতে করে মুখ তুলে চোখে চোখ ফেলতেই হঠাৎ ক্ষিপ্ত জন্তুর মত কালী বোষ্টুমীর সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে উঠল—ও হারামজাদী ভাতার খাগী লা—বেলা মাথায় করে কোন চুলো থেকে আমার ছেরাদ্দি করতে এসেছিস লা—

—পেসাদ, পিসী এই পেসাদ নাও। নিয়ে এনু পাটবাড়ী থেকে ফিরতি পথে—।

কালী আবার চুপ করে গিয়ে অবোধ্যতার দৃষ্টি তুলে দেখতে লাগল। বৃন্দা কাছে এসে মোড়কটা নামিয়ে রাখল কালীর সামনে। কালীর চোখ দুটো মোড়োকটার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেমে আসে মাটিতে। তার সমস্ত মনোযোগ তীব্রভাবে জড়ো হয়ে থাকে সেই একটি লক্ষ্যস্থলের উপরে। আঁচলের খুঁট তুলে চোখের কোণায় এতক্ষণ ধরে জমে ওঠা অর্ধেক

শুকিয়ে যাওয়া বড় একটা জলের ফোটাকে মুছে ফেলে দিয়ে মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে ফুলগুলো সরিয়ে ফেলে একটা বাতাসা তুলে টপ করে মুখে ফেলে দিল। মিষ্টি রস লালায় মিশে মুখের গহ্বরে ছড়িয়ে পড়তে মুখের কৃশ চামড়ার ভাঁজগুলো মোলায়েম হয়ে এল, মুখটায় একটা মধুর স্বাদ উপভোগের পরিতৃপ্তির ছবি ফুটে ওঠে। আরেকটা বাতাসা তুলে নামিয়ে রেখে সে নারকেলের কুচিটা মুখে ফেলে কষের মাড়িতে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগল। বৃন্দা কলসী থেকে ঘটিতে জল গড়িয়ে কালীর সামনে হেঁট হয়ে ঘটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। কিন্তু হেঁট হতে গিয়ে আঁচলটা অমনি মাটিতে খসে পড়ে কোমর অবধি তার দেহের সারা উপরিভাগ অনাবৃত হয়ে রইল। কালী নারকেলের কুচি চিবোনো বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগল বৃন্দার কোন জায়গায় সামান্যও টোল না খাওয়া নিখুঁত দেহ গঠনের দিকে।—কি গড়ন ছুঁড়ির! মরি—সাক্ষাৎ পিতিমের মত যেন মাজা কোমর বুক ছুঁড়ির। কি খায় যে এত আহ্লাদে ভরা ননীর গতর পেয়েছে? ভিক্ষে করা খুদের অন্ন আর খুঁটে আনা শাক সেদ্ধ? ছুঁড়ি নিশ্চয়ই কোথায় লুকিয়ে চুরিয়ে ফলার খেয়ে বেড়ায়! কিন্তু কে দেবে এই চামারদের দেশে বিনে পয়সায়?

কিন্তু বৃন্দার শুদ্ধ হোমের নৈবেদ্যের মত দেহে কোন পঙ্কই গায় ধরে না, পদ্মের মত টলটল করে সরু কাটিমূলের বৃন্ত থেকে। কিন্তু এ গতর, এ নদীতরঙ্গে ভরা যৌবন কি শুধু থান কাপড়ে বেঁধে রাখার? আর নিরন্ন দিন গোণার? ভাবল কালী।

—চল পিসী গো, ভিক্ষে সেরে আসি। জলের ঘটি আলগোছা তুলে ঢকঢক করে খেয়ে নামিয়ে রাখল কালী।—হরিহে—মধুসূদন!—সমস্ত দেহ কাতরিয়ে নাম স্মরণ করে উঠে দাঁড়াল সে মেঝে থেকে। পুরোনো ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে গলিয়ে লাঠি হাতে করে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বৃন্দাও ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে এসে শেকল তুলে দিল দরজায়। কালী বোষ্টুমী আর বৃন্দা দুটো বিভিন্ন পথে যায়। অত্যন্ত মন্থর গতিতে কিছুক্ষণ হেঁটে একটা দরজার সামনে এসে কালী অনেক যুগের অভ্যস্ত গলায় ডাক দিল—হরে কেষ্ট! দুটি ভিক্ষে দাও গো কে আছ বাড়ীতে।

মুকুন্দ হঠাৎ টের পেল তার মধ্যে কি যেন ঘটছে। কি তা সহজে বোঝা যায় না। মনে হয় একেবারে নতুন এই ঘটনা, কিন্তু পুরোপুরি অচেনা বোধ হয় না। লক্ষণগুলো তাকে বিহ্বল করে। ভাবটার গোড়া মনে হয় দেহে, কিন্তু আরেকপ্রান্ত পথ করে নেয় মনে,—নাকি মনের তীর ছেড়ে ডুব দেয় কোন সব অপরিজ্ঞাত স্তরে যা কখনও মনে হয় স্মৃতির, কখনও বা হৃদয়; আবার মাঝে মাঝে মনে হয় তা সর্বদিক মুছে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসা মরণের মত। মুকুন্দ শেষেরটায় এসে থমকে ভাবতে লাগল। সে যখন শিশু তখন থেকে মরণের একটা বাইরের চেহারা সে দেখে এসেছে। তার বুড়ো দাদার যখন মৃত্যু ঘটল। তারপরে যৌবনে বাবার মরণের কালে। শরীরটা হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সেই দুর্দিনের দিনগুলোয় সে দেখেছিল তার বউয়ের কোলে একটা নবজাত শিশুর চোখে তেমনি ঘুম লেগে। কিন্তু ভিতরে, চোখের ঘুমের নীচে তা কেমন দেখতে? কী তা যার নাম শুনে অন্য কি শিউরে ওঠে, কিছুতেই মেনে নেয় না জীবনের সঙ্গে তার নিকট মিত্রতা। আপনার জানায় একেবারে নিছক জানতে পারা যায় কি করে? কোনোদিন মুকুন্দ মরণের এই যে গোপন অব্যক্ত একটা অনিবার্য পরিচয় আছে তা অনুভব করেনি। সে বাইরের আকারে আলোয় পরিশোভিত সীমা মুছে গিয়ে অন্য সীমাবিহীনতাকে ভাবতে পারে নি যাও এই

আধারেই শাশ্বত। কতকগুলো মনগড়া উপায় ভেবেছিল মরণের চেহারা, ভেবেছে এমন চরিত্র দিয়ে যে তার দেহ মন প্রাণ আর তার চেয়েও গভীরতর অনুভব—কল্পনামাত্রই মরণের যে কোনো ধারণাকে সরিয়ে ফেলেছে অস্পৃশ্য কিছুর মত। তার সন্দেহ হয়, এখন যা ঘটছে তার দেহমনের অন্তঃস্থলে অব্যক্ত থেকে, তাই কি মরণ?—

কিন্তু মুকুন্দর মনে হয় তা জাগরণের মত। এ জাগরণেরও সীমা নেই। শরীরটার পর্দায় পর্দায় যখন তা এসে ধাক্কা দেয় তখন হয়ত মরণেরই সেই নিহিত গোপন সত্যটার মত আসে তা। তার জরায় জীর্ণ দেহকে অসংখ্য নখাঘাতে ভিতর থেকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চায়। কিন্তু তার উদ্বেগ হয় না। বাঁচাবার একটুও ইচ্ছা করে না দেহের পচা ঘুনধরা কাঠামোটাকে। যে উদ্দাম লবণাক্ত স্বাদ আছড়ে আসে তার অবশ বেলাভূমিতে—সে প্রাণপণে আহত হতে চায় তাতে। সে যেন ছেড়ে দিতে পারে তার অস্তিত্বের ভঙ্গুর ভেলাটা—রসের ঢেউয়ে অল্প অল্প করে গলে ক্ষয়ে যেতে অনুভব করে অসাড় চেতনারাশি।

প্রতিদিনের মুকুন্দ কাঁসরীর হাত দুটো চির অভ্যস্ত যন্ত্রের মত নিপুণভাবে ঝালাই করে চলে। কখনও মুখ তুলে তাকায় রাস্তার দিকে। কে যেন অনাগত আসে মানুষগুলোর মুখের ছায়ার ফাঁক দিয়ে কোথা থেকে। চুল্লীটায় দুমুঠো ঝুরো কয়লা চাপিয়ে সে হাপর ঠেলতে লাগল। অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে লাল-অগ্নিময় ফোটাগুলো বড় হয়ে উঠতে লাগল। এক এক করে ফোটাগুলো জুড়ে যায়, তারপর হঠাৎ একটা শিখা সবেগে নেচে উঠল। মুকুন্দ আবিষ্টের মত দেখতে লাগল। হাপরটা ক্রমাগত ঠেলে চলে, আগুন গন্‌গন্‌ করে ওঠে। হাতটার জানা আছে কখন থামতে হয়, একাদিক্রমে পঞ্চাশাধিক বছরের অভ্যাসে। কিন্তু কেঁপে কেঁপে ওঠা সেই স্বচ্ছ দোপাটি রঙের শিখার দিকে মুগ্ধ হয়ে থাকে অবাক চোখদুটো তার। ঘন পাকা ভ্রূর নীচে থেকে চেয়ে চেয়ে আবিষ্কার করছিল কিছু, যার সঙ্গে তার মধ্যে নিবিড় সেই কিসের সূচনার একটা অবোধ্য মিল রয়েছে। তাই কি মৃত্যুর মত? এই ভস্মহুতাশনের প্রলয় দীপ্তির মত অশেষ তরঙ্গে এসে পড়ছে তার ভিতর। তেমনিই যেন জেগে উঠছে কিসের নর্তনশীল পদবিক্ষেপের ছন্দাঘাতে। আবার কি যেন বলছে এই সঙ্গে পুড়ে শান্ত ছাই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। সে চোখ ফেরাতে পারল না। বিনা প্রয়োজনে দু মুঠো কয়লা পুড়ে পুড়ে নিভে যেতে দেখল। তারপর হাত গুটিয়ে ডুবে যায় তন্ময়তায়। মনে হয় তাও মরণ হতে পারে। কিন্তু দুচোখ ভরে মনে আসে বৃন্দার মুখখানা। আজ যেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বলছিল কি সব কথা। তা মনে নেই। মনটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহ স্তিমিত প্রদীপের মত সাড়াহীন মুছে গেছে এক অব্যক্ত প্রতীতির অন্ধকারে। বৃন্দার সেই শুক্তির বুকে জ্যোৎস্না পড়া হাসি—আর দুচোখে অমাঘোর মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের ইসারা তাকে জাগিয়ে রেখে গেছে মৃত্যুর মত, মুছে যাওয়ার মত—একটা পারাপারহীন স্মৃতিরেখা সমুদ্গত হওয়ার মত।

শণের গোছার মত চুলগুলোয় আঙুল বোলাতে বোলাতে মুকুন্দ ভাবতে লাগল সেই কবেকার দুর্দৈবের ঘটনাটা যার ধাক্কায় সে ভাসতে ভাসতে এইখানে এসে ঠেকেছিল, মনে হয় যেন কাল। আর যে দীর্ঘ বছরগুলো পেরিয়ে গেছে তারা মাত্র কয়েকটা সাদা পাতা যাতে কোনো লেখাই পড়েনি। সে শোনে তার গলাটায় হঠাৎ তরুণ স্বর উচ্ছ্বসিত ফুটতে,—বিন্দা, বিন্দা! তরে লয়্যা যামু এখান থেইক্যা। এ দুকানডারে বেইচ্যা যামু কইলকাতা। সেখানে হাটবাজার ভারী। নয়ত আরও দূর বিদেশে।—বিন্দারে, সুখে থাকুম আমরা দুজনায়।

বুঝতে পারে না কখন দিনান্তের আলো ম্লান হয়ে সন্ধ্যা নামল। গৌরাঙ্গের মন্দিরে

কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ হয়। খেয়া ঘাটে নৌকায় বাতি জেবলে কালো নিথর ছবিগুলো ভেসে থাকে ছাই বর্ণের আঁধারে। তারাগুলো জ্বলে ওঠে।

রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায় সহরের ভিতর। দোকানে দোকানে গ্যাসবাতির তীক্ষ্ন সাদা আলোয় মায়াময় দেখায় সড়কগুলো। বৃন্দা একটা ক্ষুদ্র প্রদীপে শিশি থেকে কয়েক ফোটা তেল ঢাললো। তারপর দেশলাই জেবলে ধরিয়ে প্রদীপটা নামিয়ে রাখল তুলসী মঞ্চের গোড়াতে। প্রণাম করতে করতে সে দেখে ছায়াগুলো জমে রয়েছে চারিপাশে। কেবল প্রদীপের সলতেটার মাথায় অকম্প দেখায় হলদে আলোর শিখা। তুলসীর কাঠি কাঠি ডালগুলো কেমন অদ্ভুত। বলে নাকি উনিই নারায়ণ। তাই গাছ হয়েও কি ভাব রয়েছে, প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখায় স্বপ্নের মত। প্রণাম করে সে উঠে এসে দাঁড়াল ঘরের বাইরে। ভিতরে কালী বোষ্টুমী সুর করে পাঁচালী আউড়িয়ে যাচ্ছিল।

কর্কশ গলার আওয়াজ থেকে থেকে থেমে আসে, পদ ভুল হয়ে যায়। আবার হোঁচট খেয়ে সজাগ হওয়ার মত সে আউড়িয়ে চলে জোরে জোরে। মাঝে মাঝে পাঁচালীর ফাঁকে দু-চারটে অসংলগ্ন কথাও ঢুকে যায়। বৃন্দা অন্য ঘরটায় ঢুকে ঝোলান বাঁশ থেকে একটা ধোওয়া থান পেড়ে নিয়ে পরনের কাপড় ছেড়ে রেখে দিল এককোণে। তারপর ভ্রূ অবধি ঘোমটা টেনে আঁচল জড়িয়ে নিল গলায়। পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল অন্যঘরে। সে ঘরে কুপি জ্বলছিল। কালী বোষ্টুমী দুলে দুলে আবৃত্তি করছিল। নেমে গিয়ে দরজা সন্তর্পণে খুলে বৃন্দা রাস্তায় বেরিয়ে এল, তারপর ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে এগিয়ে গেল একদিকে।

একটু পরেই দরজায় শিকল নাড়ার আওয়াজ হল। কালী বোষ্টুমীর পদ আওড়ানো থেমে গেল। দ্বিতীয়বার আওয়াজ কানে পেঁছতেই কালী চেঁচিয়ে উঠল,—অ বিন্দে, দোরটা খুলে দে বাছা, মধুবাবু এয়েচে—।

কিন্তু বাইরে থেকে গলা শোনা গেল,—দোর খোলাই যে দেখছি দিদি, বিন্দে বুঝি বাড়ী নেই?

—বাড়ী নেই? বলি ও বিন্দে,—কাপড়ের প্রান্তটা হাতে করে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে ডাকল কালী,—এসো দাদা ভেতরে তুমি। গেল কোথা ছুঁড়ি? দেয়াল ধরে দুপা এগিয়ে দরজার কাছে এসে সে চাইল উঠোনের দিকে। তুলসীতলায় প্রদীপের মৃদু আলোর ফোটাটায় চোখ গিয়ে থেমে রইল। দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়াল মধু গাঙ্গুলী।

—এঃ—বাড়ী—হ্যাঃ—বেরিয়েছে বুঝি হ্যা হ্যা,—মধু গাঙ্গুলীর প্রাণখোলা হাসির মধ্যে একটা নৈরাশ্য বেজে উঠল।—তা একটু সাঁঝের ঝোঁকে বাজারে ঘুরতে মেয়েছেলেরা ত চাইবেই। ভদ্দর আর অভদ্দর—তা আমি আজ আসব জানত বুঝি, হ্যা হ্যা হ্যা—

—ঝেঁটিয়ে মুখ ভাঙ্গব হারামজাদীর—বাড়ী ফিরুক—হ্যা আমার নাম কালী বোষ্টুমী দেশ সুদ্ধু নোক নাম শুনলে ডরায় আর সেই আমার কথা গেরাহ্যি নেই—থেঁতো করব বিটিরে।—আক্রোশ সপ্তমে উঠল ঠেলে কালীর গলায়।

—আহা হা দিদি রাগ কোরোনা—এই নাও তোমার জন্যে খাবার এনেছি। ভাবলাম দিদির দাঁতগুলো নেই—তাই নরম খাবার ছাড়া ত খেতে কষ্ট হবে। গলায় প্রগাঢ় সহানুভূতি আর আন্তরিকতার সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট ভালমানুষী ভরা হাস্যোদ্ভাসিত মুখে মধু গাঙ্গুলী চাঙ্গারীতে বাঁধা ময়রার দোকান থেকে সদ্য আনা খাবার বাড়িয়ে ধরল কালী বোষ্টুমীর মুখের নীচে। রাগে পুরো খুলে যাওয়া করমচার মত চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল

কালীর। পুরু ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে,—দরজার আবছায়ায় তার বিপুল আকার-বর্জিত মূর্তিটা বীভৎস দেখায়। কিন্তু চাঙ্গারীর ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত মোলায়েম উপাদেয় গন্ধ নাকে পৌঁছতেই কালীর ভিতরে ক্ষুধার জীবগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। সে গালি বন্ধ করে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

—আহা দাদা—বেঁচে থাকো,—অভাগীকে কেউ দেখেনা গো, মায় দেবতাও কানা হয়ে গেছে, আর ওই নেমোখারাম ছুঁড়িটে,—বলতে বলতে ভিতরে অবরুদ্ধ তীব্র আবেগের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কালী বোষ্টুমী,—আমাকে পেট ভরে দুটো খুদ সেদ্ধও দেয় নি আজ কদিন। ওগো কেউ কি দেখনা অধর্মের বিটির অত্যেচার—!

কাঁদতে কাঁদতে একবার চাঙ্গারীটার একধার থেকে শালপাতা উঁচু করে কালী বোষ্টুমী চেয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস টেনে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অবার বকতে শুরু করল।

মধু গাঙ্গুলী এদিক ওদিক নিরাশ চোখে তাকিয়ে আবার কালীর প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলল প্রফুল্ল গলায়—তুমি আগে খাও দিদি। আমার সামনে খাও—আমি চেয়ে দেখি—! হাসতে হাসতে চকচকে পাম্প সু দরজার বাইরে খুলে রেখে ভিতরে এসে মেঝেয় বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল।

কালী বোষ্টুমীর সুদীর্ঘ আর রুক্ষ সমবেদনাহীন জীবনেতিহাসে মধু গাঙ্গুলী একটা দৈবসম্পাতের মত এসে পড়েছে। এই প্রথম সে শোনে গলার আওয়াজে যে তরল মাধুর্য গড়িয়ে এসে তার হৃদয়ে ফোটা ফোটা পড়ে জুড়িয়ে দেয়। তার কর্কশতায় কড়া পড়ে থাকা হৃদয়ের আবরণ অমনি মুহূর্তে গলে গেল। যেমন স্বতঃস্ফূর্ততায় সে গালি পেড়ে ঝগড়া করে তেমনি সমান আবেগে ইচ্ছে করে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে। যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলতে। কিন্তু তখনই মনে হল তার দেবার মত কিছুই নেই। কথা বলতে বলতে তার গলা থেকে আশ্চর্য সব স্নেহের কথা বেরিয়ে আসে।

—না গো বাবু, ছুঁড়িকে হাতে গড়ে পিটে মানুষ করেছি। বিয়ে দিনু কিন্তু পোড়া কপালী দুবছরেই বিধবা হল।—সেই থেকে ওর মনডা কেমন উদাসতরো, নিজের খেয়ালেই থাকে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—নিঃশব্দে চুপ করে থেকে হাসতে লাগল মধু।—তা বললে কি আর চলে দিদি, হাজার হোক মেয়েমানুষের দেখবার কেউ না থাকলে সে যেন হলো বেওয়ারিশ আমবাগান। যে পারে সেই পাড়ো।—এ্যা—বোলো বিন্দেরে—মেয়েছেলে, এই জীবনে কত সখই না আছে, আর তোমার এই বুড়ো হাড় কটা কি কোনোদিন শান্তি পাবে না? বলে একটিপ নস্যি নিয়ে মধু গাঙ্গুলী বিদায় নিল।

মধু চলে যাওয়ার পর ঘরে এসে কালী বাকি ছানার জিলিপী কটা খেতে লাগল। অমৃতের তার বুঝি এত ভাল না। সমস্ত দেহটা যেন টের পায় সুখাদ্যের স্বাদ। দুচোখ তৃপ্তিতে এলিয়ে থাকে। সবকটা ফুরিয়ে গেলে কালী বোষ্টুমী আঙ্গুল দিয়ে চাঙ্গারীর তলার শালপাতা হাতড়াতে লাগল। ঘরময় শালপাতা ছিটিয়ে পড়ে। একটু জলতেষ্টা পায়। পেতলের ঘটিতে গড়ানো জল একঢোক গিলতেই মুখ থেকে মিষ্টিগুলোর স্বাদ নিমেষে চলে গেল। সে যেন একটু নিরাশ হয়েই চেয়ে রইল চারিদিকে ছিটানো শালপাতাগুলোর দিকে। তারপর ঘটি নামিয়ে রেখে কালী পা ছড়িয়ে বসে ফ্যাল ফ্যাল

করে শূন্যে চেয়ে দেখতে লাগল। ধোঁওয়ান কুপির কাঁপা আলোয় তার মুখের গভীর অদ্ভুত রেখাগুলো প্রাচীন তান্ত্রিক শিলামূর্তিতে পরিণত হয়ে নিশ্চল হয়ে থাকে। একটু পরে সে বিড় বিড় করতে থাকে,—অসংলগ্ন উক্তিগুলো জোড়া দেওয়া যায় না কিন্তু একটা বিশৃঙ্খল রূপ নেয়,—দেবতা দেয় না—মানুষে দেয়। মানুষে দেয় না—আমাকে দিবিনে কেন—আমি কি অপরাধ করেছি—কালী বোষ্টুমী কার সব্বনাশ করেছে? না, ওদের চোখে সয় না—আমার রূপ নেই যোবন গেছে, থাকলে দিতিস্ চোক্‌খেকোরা ব্যাটারা—কথ্‌খনো না—সব ঢালতিস গে দেবতার পায় নয় মাগীর ভব্‌ভে! আমার বেলা কেউ না! আ—আমি যেন বেনাজলে ভেসে এসেছি। তিনকুড়ি বচ্ছর তোদের পথে খুঁটোর মত গজিয়ে আছি। তোদের আহ্লাদ কেবল মিছে কথায়—কেবল মিছে কথা—মিছে মিছে মিছে—থুথু!—হরে-কেষ্ট হরেরাম রামরাম—

কালী বোষ্টুমী দুলে দুলে উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করতে লাগল। তারপর চুপ করে কি চিন্তা করে আবার বলতে শুরু করল রুক্ষ অনার্দ্র গলায়,—মধুর মত ছেলে হয় না—যেমন নাম তেমনি রূপ—তেমনি মুখে মিষ্টি কথা, আহা কি ভাল জিলিবীগুলো এনেছিল গো। আবার আনবে বলে গেছে—বলেছে দিদি তুমি আমার সামনে থাবে, দেখলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। ও কালীরে ঠিক চিনেচে—ও আদৎ জহুরী—নকলে কি মন ওঠে? বলেচে রোজ আসবে—ছুঁড়িটেরে মনে নেগেচে, বলে ছুঁড়ি ওর দাসী হলে গা ভর্তি খাঁটি গয়না গড়িয়ে দেবে—বলে কেন দুক্‌খু করলে দিদি—অমন ভাইঁকি থাকতে তোমার ভাবনা—এই ঘরে পালঙ্ক দোব বসবার জলচৌকি দোব আয়না দেয়া আলমারী দোব। বলেচে আমার জন্যে থিপ্‌তুরে পানের ডাবা আর পিকদানী নিয়ে আসবে—ছুঁড়ির পোড়াকপাল আলো হয়ে যাবে—বলে অমন ডাগর ডোগর শরীল কি থান ঢেকে খুদ সেদ্ধ গিলে মাটি হতে দিতে আছে। আমি বলি,—ও ছুঁড়ি তুই গাঙ্গুলীর কথা শোন—তা'লে সকল দুক্‌খি ঘুচে যাবে—

নিকষ কালি রাতের তলায় হেঁটে ফিরে আসছিল বৃন্দা। পথে আসতে আসতে বুড়ো বলরাম ঠাকুরের মাটির চোখ দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয়েছিল জগতের সব চোখই বুঝি অমনি স্পন্দহীন। কেবল তার বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডের চোখ দুটো ছাড়া। কেন থেকে থেকে নির্মম আশায় প্রাণ চেয়ে থাকে। জনহীন হয়ে থাকা সরু গলিটার দুধারে নীরব সাক্ষী দেয়ালগুলোর মত কেন হয় না। জীর্ণ হয় তবু এত নির্বাক। পা দুটো আনমনে পড়ছিল, কি এক হাল্কাভাব ছিল তাদের বিক্ষেপে। যেন এক মুক্ত পথের বার্তা পা দুটোর কাছে আগেই এসেছিল কিন্তু মন এতদিন জানেনি। দরজায় এসে সে কান পাতল। কালী বোষ্টুমী বিকৃত গলায় কি বলছিল বোঝা যায় না—কিন্তু বৃন্দা শুনল,—ছুঁড়ির পোড়াকপাল আলো হয়ে যাবে।—

একটা নিরপেক্ষ শ্বাস ফেলে সে দরজার শিকলে হাত দিল। কি ভেবে আবার হাত নামিয়ে ঠেলতেই কবাট খুলে গেল। উঠোনে এসে বৃন্দা তাকাল। তুলসী মঞ্চে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে একটা বেড়াল তাকে দেখে লাফিয়ে নেমে এসে পায় গা ঘষতে লাগল। বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে সে উঁকি দিল কুপি জ্বালা ঘরে। চারিদিকে ছড়ানো শালপাতা আর শূন্য চাঙ্গারীর মাঝখানে বসে কালী বোষ্টুমী বিড় বিড় করছিল। চোখ দুটো আদিম অর্থবিহীন তন্ময়তায় বিভোর হয়ে থাকে। বৃন্দা অভ্যস্ত গলায় ডাকল,—ও পিসী, কে তোমায় আবার পেসাদ এনে দিল গো এই রেতে?

—মুকুন্দদা, বলি হাত দুটোকে কি জিরেন দিতে নেই একটি বারও?

মুকুন্দ হাতের কাছ থেকে চোখ তুলে এনে রাখল বৃন্দার মুখে। তেমনি চন্দনের তিলক কাটা, সদ্য ধোওয়া উজ্জ্বল দেখায় মুখখানি। যেন নিত্য এক একটি নতুন পদ্ম ফোটে—ভাবে মুকুন্দ। কিন্তু অনেক দূরে, আলোর স্ফটিক জলে টলটল করে।

—বিন্দা, আমার মন কইতেছিল আইজ ভোর রাতে যে তরে দ্যাখতে পামু।—

—তোমার বুঝি মন কেমন করছিল!—

মুকুন্দর নামানো চোখ দেখতে পেল না বৃন্দার দু চোখে হাসির লাস্য। কিন্তু গলার আওয়াজে যে নিবিড় রস চুঁইয়ে এল তা তার শিরায় শিরায় মাদকতার ঢেউ বয়ে নিয়ে আসে। বলল মুকুন্দ,—তুই চইল্যা গেলে পর আমার দিনমণি অস্ত যায়। তরে দেইখ্যা আবার ওঠেন তিনি।

বৃন্দা খিলখিল করে হেসে উঠল। পথের চলতি মানুষ দু চারজন থমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু প্রবীণ মুকুন্দ আর বৃন্দার দিকে চেয়ে তাদের মনের ভাবটা সন্দেহ করল না।

—তোমার দিনমণি বুঝি আমি আঁচলে গেরো দিয়ে রেখেছি?—কটাক্ষ করে জানতে চাইল বৃন্দা।

—মনডারে দিয়া। সে এমন গেরো যে খুইলবার পারা যায় না।

—তুমি কি করবে মুকুন্দদাদা, যদি তোমার দিনমণি না ছাড়া পান, যদি আর না জাগেন?

মুকুন্দর মনের অবতলে সেই গভীর কালো ছায়াটা প্রত্যক্ষ এসে পড়ে। বৃন্দার উচ্ছল হাসিঠাট্টার প্রবাহ সেই গভীর অতলান্ধকারের বুকেই বুঝি খেলে বেড়ায়। মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়। ভুরু উঁচিয়ে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাইল মুকুন্দ বৃন্দার মুখের দিকে। কিন্তু বৃন্দার ঢলঢলে মুখখানিতে চেয়ে মুহূর্তে মুছে যায় বুকের সেই শীতার্ত ভাব, একটা অনুরাগের তপ্ত শিহরণ কাঁপিয়ে দেয় বুকের জীর্ণ খাঁচাটা, উদ্বেল হয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডের আঘাত। যদি মুছে যায় কোন দৈবে সব কিছু। সে ঝাঁপ দিতে পারে বৃন্দার পদ্মের মত মুখের প্রতিচ্ছবি যে গভীর হৃদয়নীরে ভাসে, সেখানে। কি একটা কথা মনে পড়ায় সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,

—কালীদিদি আর আসেনা এ পথ দিয়া?

বৃন্দার মুখে একটা ছায়া পড়ে। সে জবাব দিল—না, আজ কদিন ধরে বাতটা বেড়েছে বড্ড, ঘরেই বসে থাকে,—আর,—বলে অন্যমনস্ক হয়ে থেমে রইল।

—আর কি?

বৃন্দার দুচোখ আত্মমগ্ন হয়ে ছিল। অনেক গভীরে কি কতকগুলো সুখদুঃখ বেদনা আকাঙ্ক্ষার ছায়া খেলে বেড়ায় কিন্তু উপরে রোদের আলোয় দেখায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কালো। হঠাৎ বৃন্দা জিজ্ঞাসা করল—মুকুন্দদা, তুমি অনেক দেশ ঘুরেছ না?

—হুঁ, অনেক দ্যাশ দেখ্‌সি—

—আর তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

একটা দুষ্টুমী ভরা হাসিতে কুঁচকে ওঠে মুকুন্দর চোখের কোল। বলে,—আমার সাথী হবি? তরে সাথে লয়্যা আবার পথে পথে কত দ্যাশ দেইখ্যা বেড়াই দুইজনে!

গলার স্বরটা যেন আচমকা প্রবল হয়ে উঠল শেষের ভাগে, হঠাৎ একটা প্রবল ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেল যা কানে ঢুকতে বৃন্দা অবাক হয়ে চাইল তার মুখের দিকে।

একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে?—

—এক্কারে আন্তরডার ভিত্‌রে কইর‍্যা! তরে মিছা কইতেছি না রে বিন্দে—, বলতে বলতে মুকুন্দর গলা খাদে নেমে এসে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে,—তর সোহাগের মুখখানা আমি ভুলতে পারি না এক নিমেষ—তুই আমার মরমডেরে কিন্যা লইছস্‌ রে বিন্দে—তর রূপে আমার হির্‌দয় মইজ্‌ছে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে অপ্রতিরোধ্য আবেগের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে,—তার সমস্ত শরীর জীর্ণ ভেলার মত খানখান হয়ে পড়তে চায়। কিন্তু বৃন্দার নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে মুকুন্দর চোখ দুটোয়। একটা কালহীন আলো সেখানে জ্বলছে আর সবই নিভে গেছে। দিন আর রাতের আলো, অন্ধকারের আবর্তিত হয়ে আসা আর অন্ধকারের বিদারণ, সকল সত্যাসত্যের বোধ, সকল প্রকৃত অপ্রকৃতের চেতনা। বৃন্দা কচি খুকীর মত খুশীতে ডগমগ হয়ে বলে,—তোমার সঙ্গে থান কাপড় পরে ঘর ছাড়লে লোকে কি বলবে—?

—কইবে রাধারাণীর বর মরসে!

কিশোরী মেয়ের মত আবার হেসে উঠল বৃন্দা। মুকুন্দও জোরে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। কিন্তু সামলাতে পারে না। হাসতে গিয়ে হঠাৎ বিষম লাগে। একটা প্রবল কাশির সঙ্গে অনুভব করল তীক্ষ্ন বেদনা বুকের গোড়ায়—খানিকটা থুতু থু করে ফেলতে গিয়ে দেখল তার সঙ্গে চাক বেঁধে খানিকটা রক্ত। দারুণ কাশির বেগ কমে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে যায় চোখের চারিদিক, মনে হয় পৃথিবী যেন তলিয়ে গেছে। কোন এক অসীম শূন্যতায়, সেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ কোন কিছু পোঁছয় না। সেখানে বৃন্দার টলটলে মুখখানার ছবিও মুদিত হয়ে যায় অন্ধকারে। মুকুন্দর অন্তরে আবার সেই বোধটা ফিরে আসে যা আজ কদিন থেকে সে টের পাচ্ছিল। যা একই সঙ্গে মনে হয়েছিল অমৃতের মত আর মৃত্যুর মত।

সে তাকিয়ে দেখতে পেল বৃন্দার মুখচ্ছবি কেমন বেদনায় ম্লান পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

—ও কিসু না রে—! পুরাতন একটা ব্যাধি। গলায় প্রবল সাহসের ভাব ফোটাতে চেয়ে বলল মুকুন্দ।

বৃন্দা কিছু বলল না। কেবল একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল মুকুন্দর ঝুঁকে পড়া শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দিকে। দেখতে দেখতে আলো নিভে আসছিল সেখানে। চোখের পাতা দুটো খুলে গোল হয়ে যায়—ঘোলাটে বিস্ফারিত দুচোখ যেন কি উপলব্ধি করে অন্যমনস্ক হয়ে ফিরে তাকায় রাস্তার জনপ্রবাহে। একটা ভেঙ্গে পড়া বাড়ীর পরিত্যক্ততা জানায় সে বাড়ীর চেহারা। মনে হয় না কিছুক্ষণ আগে সেখানে অদ্ভুত এক হৃদয়ের অঙ্কুর ফুটে উঠছিল পর পর। এক এক করে ফুটে উঠতে লাগল মুকুন্দর অশেষ বার্ধক্যের চিহ্নগুলো, সাদা ধপধপে চুল, সাদা ভুরু, দন্তহীন মুখের গহ্বর, হাতের চামড়ার নীচে শিথিল উঁচু শিরাগুলো। বৃন্দা কি এই অশেষ জরার সঙ্গে হৃদয়ের ধমনিত প্রণয়কে মিলতে দেখেছিল? এই গ্রন্থি খুলে আসা জীবনের গোধূলি মুছে নামা দেহের লুপ্ত রেখা ধরেই অভিসারে বেরোতে চেয়েছিল? কিন্তু তার কানে যেন এখনও লেগে আছে সেই প্রগাঢ় স্বরের অনুনাদ, সৃষ্টির শিকড়াভ্যন্তরে নিবিড় রসের চেতনার মত যা পরিপ্লুত করতে চেয়েছিল তার সমস্তকে। হয়ত ক্ষণমুহূর্তের জন্য সেই প্রত্যয় কাজ করেছিল। তবু তাকে ভ্রম বলে সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। নিস্তব্ধ বনে বাতাসের স্মৃতির মত

কোথায় তা জেগে—চোখের দেখা এই ছবি কিছুতেই মনে হয় না পুরোপুরি সত্য। হয়ত এ একটা প্রতীক, এক অপ্রত্যক্ষ জন্মলাভের আনন্দকে গোপন করার।

—শরীলডা ভাল যাইতেছে না আইজ কদিন। হাসপাতালে যাব মন করলাম পরশু—

বৃন্দার নিশ্চল মনের মধ্যে একটা প্রবল উৎকণ্ঠার মত কি যেন প্রকাশ পায়,—জ্বর-জারি হল নাকি মুকুন্দদা—ব্যামোয় পড়লে বড় কষ্ট পাবে গো—

মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে স্থির হয়ে ছিল মুকুন্দ। তখনও ধড়াস ধড়াস করছিল বুকের মধ্যে। সমস্ত দেহ বেদনায় ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক কোষে কোষে তা ব্যাপ্ত হয়। এই একটু আগেই যে দেহের প্রান্তর বয়ে অপূর্ব সুখানুভূতি ভরে উঠেছিল। সে নির্বাক থেকে আত্মসমর্পণ করে এই স্মৃতিহীন অন্ধ বেদনার কাছে। সেদিকে চেয়ে বৃন্দার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

—শুয়ে পড় মুকুন্দদা। জোর দিয়ে বলল আবার সে।

মুকুন্দ মুখ তুলে তাকাল,—ও কিছু না রে—অমন আইজ বিশ বৎসর হইতেছে,—মুখে চোখে উজ্জ্বলতা ফোটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল,—তরে দ্যাখলেই সাইর‍্যা যাব আপনিরে বিন্দে! তুই হলি আমার সর্বশূলহরা বিশল্যকরণী—

—এখন শুয়ে থাকগে। আর কাজ করে দরকার নেই। ওই দেখ তোমার উনুনও নিভে গেছে! কি করে ঝালাই করবা এখন?—শুয়ে থাক—বৈকেলে আসব খন আর বুড়োশিবের চন্নামেত আনব।—চোখে একটা বেদনা সংগোপন করে বৃন্দা ফিরে গেল।

কালী বোষ্টুমীর গজরানো আর দিনে রাতে থামে না। বলে যায় আপন মনে,—অধম্মের বিটির চোখে চামড়া আছে? হাতে করে অনাথ মানুষ করলেম, খাওয়ালেম দাওয়ালেম বে দিলেম। কি করে পেরেছিনু? এই গতর খুইয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে, ঘসি ঠুকে কাঠ কুড়িয়ে, ক্ষেত ভেঙে শাক খুঁটে আর তাই বেচে। কপাল দোষে বিধবা হলি। তবু অঙ্গের জলুষ মরেনি ত তোর একরত্তিও। ও গা-গতর নিয়ে কি করবি? ধরে রাখলে পেট চলবে? বলে,—আমি রাধারাণীর দাসী! এ দেহ কেষ্টর সেবায় দিনু। মরে যাই! কেষ্টর মাগীতে অরুচি হয়েচে লা! নইলে চোক্‌খেকো এমনি দুক্‌খি দেয়? আর দুমুঠো অন্নও কেউ দেবে না। দেখিস্! কেউ না। রাস্তায় ঘুরে জীবনটাই গেল বৃথে। বেরেম্‌ভাণ্ডে কেবল পেটের আগুন জ্বলছে—মরলেও বুঝি জুড়োয় না!—

কিন্তু বৃন্দা এতদিনে সত্যই বিচলিত হয়ে উঠল। নিরন্ন থাকার কৃচ্ছতা তার জীবনে সে জানত স্বাভাবিক মতেই। তা এনে দিয়েছিল একটা উদাসী মন, যা তার একান্ত মনো-বিগ্রহে অর্পণ করার। হাসি গল্প ভিক্ষা আর বিগ্রহের সেবা—এর মধ্যে কোন বিষম ছন্দ দেখেনি একদিনও। কিন্তু মধু গাঙ্গুলীর আসা যাওয়া তাকে বিচলিত করে তুলল। এই যেন প্রথম সজাগ হয়ে উঠে সে টের পেল একটা যুক্তিহীন মর্যাদাহীন নিরর্থক অন্যায় প্রবল অনিয়মের মত তার সামান্য অস্তিত্বটুকুও মুছে ফেলে দিতে এগিয়ে আসছে। কেন হঠাৎ এ আক্রমণ? সে কোন উত্তর খুঁজে পায়না। এমন কি তাকে দুর্ভাগ্য বলেও সে দুষতে পারে না। এ যেন একটা অন্য অন্ধকার নিমজ্জিত পঙ্কিল জগতের নিয়মানুবর্তিত অন্ধ কতকগুলো জীব—তারা তাদের দৃষ্টিহীনতার অবধারিত নিয়মে খুব স্বাভাবিকভাবেই নষ্ট করে দেয় যা কিছু আকাঙ্ক্ষার আর সুন্দর। যা কিছু স্থির আর অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয় তাই যেন ভেঙে ফেলার, মুছে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। বৃন্দা এই সর্বপ্রথম

অনুভব করে তার নিদারুণ অসহায়তার গভীরতাকে। সে সম্পূর্ণ অরক্ষিতা। সহরের প্রত্যেক দেয়ালের ঘন আড়াল ফুঁড়ে যেন মধু গাঙ্গুলীর জোড়া জোড়া চোখ চেয়ে দেখে। একটা গলিত লালসা পুঁজের মত গড়ায় তার দুচোখ বেয়ে। পুরু পুরু ঠোঁঠের ফাঁকে সোনা বাঁধানো দাঁতে লেপটে থাকে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। তার ভারি গালে টোল খাওয়া অকথ্য ছবি আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তার অস্বাভাবিক লম্বা দুটো হৃষ্টপুষ্ট হাত যা মনে হয় দুটো চক্ষুহীন জন্তুর মত সব সময়ে এক পাশবিক আলিঙ্গনের কথা ভাবছে। বাইরের দরজায় তার প্রতিকৃতি ফুটে উঠতে দেখলে বৃন্দা ধরাপড়া জন্তুর মত শিউরে ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করে। কখনও একটা পশুর মত আর্তনাদ গলায় ঠেলে আসতে চায় কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া স্বরতন্ত্রীতে ঠেকে স্বর ফুটতে পারে না। প্রাণপণে সে তার চির অভ্যস্ত হরিণাম স্মরণ করে—কোনো পরিত্রাণের কথা ভেবে নয়, মাত্র তা তার সব ভাবনা চিন্তার অতীত এক অবলম্বন বলেই। কালী বোষ্টুমীর ভিতরেও যেন একটা ঘুমন্ত সাপকে ফণা তুলে জেগে উঠতে বৃন্দা দেখে। মনে হয় একটা পাতলা কাচের ব্যবধান কোন রকমে আড়াল করে রাখে তাকে এই দুটো দুর্নিবার আক্রমণোদ্যত হিংস্রতা থেকে। কিন্তু এরা দুজন তার কাছ থেকে কি কেড়ে নিতে চায়, এমন ভয়াবহ বন্যতায়? ও তার সম্পূর্ণ অন্ধকার রহস্যের দিকে চাইতে পারে না। কতকগুলো নগ্ন স্যাঁৎসেতে হাত হাতড়ে হাতড়ে ধরতে চায় যেন তার দেহটাকে। বিকট আতঙ্কে ভরে ওঠে তার মন। তার দিকে শিকারী শ্বাপদের দ্বিধাহীন দৃষ্টি তুলে ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কি একটা যা সে নিজে অনুভব করতে পারে না। আর তাই বলেই অমানুষিক ভয় হয়। ওর মধ্যে নির্ভুলভাবে নিহিত থাকতে ওরা দেখে কিছু যা উপড়ে নিতে চায়। কিন্তু বৃন্দা যে জানে তা অন্যভাবে। যা দেবালয়ের মত নীরব আর অচঞ্চল, হোমাগ্নির মত দেদীপ্যমান, ও সেখানে নীরবতা পায়—অপাবৃত হয় যা কিছু সত্য তার গূঢ় জগতে। কেন হঠাৎ তা মুছে যেতে চাইছে,—তার সৌম্যের জগৎ, আপন সমাহিত সমর্পণের জগৎ। কেন হঠাৎ অনির্দেশ্য থেকে একটা কুষ্ঠের গলিত হাত এগিয়ে এসে তার নীরব শঙ্খশুভ্র বক্ষোদেশকে খাবলিয়ে ধরতে চাইছে? সে কোন জবাব পায় না, অসহ্য গুমোটের মত পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে সারা মনে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

মধু গাঙ্গুলী আজকাল প্রত্যহ আসে। প্রতিদিন সে যেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয়, জায়গা দখল করে। প্রতিদিন অমানুষিক মনোযোগের সঙ্গে হিসাব করে তার প্রত্যেকটা সুযোগ। সমস্ত দিক থেকে বৃন্দাকে ঘেরবার চেষ্টা করে। চাঙ্গারীতে করে টাটকা শিঙাড়া আর চপ নিয়ে আসে। মাটির হাঁড়িতে করে মালপোয়া রাজভোগ চমচম নিয়ে আসে। গাঢ় অনুযোগ করে বৃন্দা কেন খায় না। হাঁড়ি হাতে করে বৃন্দাকে এঘর থেকে ওঘরে অনুসরণ করে। তাদের ময়লা উলিধুলি ন্যাকড়া ঢাকা সামান্য বিছানার উপরে জুতো সুদ্ধু পা নিয়ে গিয়ে ওঠে।—

কালী বোষ্টুমীর মুখে আর ষাট বছরের ভিক্ষের ভাত রোচেনা। বৃন্দা যখন মাড়ে ভাতে একথালা আর বড়জোর একটা শুকনো বেগুন সিদ্ধ নামিয়ে রাখে সামনে, জ্বলে ওঠে চীৎকার করতে থাকে কালী বোষ্টুমী,—ও পিণ্ডি কার জন্যে এনেছিস্—ও মানষে খায়—গরুর অছেদ্দা হবে মুখে করলে—ফেলে দে ফেলে দে ফেলে দে—আ মর্ হারামজাদী—একদিন পেট ভরে খেতে দিলো নি—এখন ওই অপদেবতার ছেরাদ্ধ গেলাবি—

বিকেলে গৃহপোষ্যা গাভীর মত কালী বোষ্টুমী বারে বারে তাকায় দরজার দিকে—

ওই বুঝি মধু এল—ওরে দ্যাখ্ ও বিন্দে—অ হতভাগী কানের মাথা খেয়েচিস নাকি,—মধুর আসার সময় হল অমনি ছুঁড়ি সটকেছে,—ও হারামজাদী, তোর মুখে নুড়ো জেবলে দোব। শিক তাতিয়ে দগ্ধে দোব তোর রূপের চেকনাই—হারামজাদী গতর বেচবি নে ত কি আমি বেচব আমার বুড়ো হাড় কখান? ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে শুরু করল কালী বোষ্টুমী।

মধু গাগুলী বাইরে থেকে গলার আওয়াজে টের পায় যে আজও পাখী পালিয়েছে। কিন্তু সে দমে না। হাসিতে দাঁত খুলে ঢোকে কালীর ঘরে। বলল,—কোরা বকুনা দিদি—দোড়োদোড়ি করবেই একটু পের্‌থমে!—মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই হিসেবে কোথাও ভুলচুক হয়েছিল। পায়ের উপরে পা তুলে আসন পিড়ি হয়ে বসে সে নিবিষ্ট মনে সিগারেট টানে, কালীর ক্ষুধার স্বপ্নগুলো একটু খুঁচিয়ে দেখে।

কখনও হাল ছেড়ে দিয়ে কালী বোষ্টুমী অনুযোগের পথ ধরে। বৃন্দার দিকে একটা বেতো হাত তুলে নেড়ে নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে—বিন্দে, মাণিক লক্ষ্মী রাধারাণী মা আমার—কথা শোন্—তোরে অনাথ বুকে ধরে মানুষ করলেম, খাওয়ালেম পরালেম—এখন বুড়ী পিসীর কথা ফেলিস নি। যা তুই আজ সাঁজে গাগুলী বাবুটির সেবা কর।—কেন, দোষ কি—তোর মা করেছে পিসী করেছে—অসতী হবি কোন মহাপাতকী বলে—জীবন ভোর দুঃখ জ্বালা কোন অভিশাপে বুকে ধরেছিস্—যা তুই একটিবার—দুঃখ ঘুচবে—গাগুলীর দাসী হবি পেটভরে খেতে পাবি জীবনভোর—কত বড় লোক,—হাতে হীরের আংগুটি ঝলমল করে দেখিস্ নি? তোর গা ভর্তি গয়না দেবে—পালঙ্ক দেবে শোবার —ওই ননীর অঙ্গ কী ধুলোয় লোটবার?

সেদিন বিকেলে আকাশ রেশমী সুতোর মত চকচক করছিল। একটা ঘরে ফেরা চিল উড়তে উড়তে ডানা কাৎ করে একবার ঝুঁকে চেয়ে দেখে হিজিবিজি রেখায় ক্ষতবিক্ষত সহরটাকে। সেই মুক্ত নিঃশব্দ আকাশের ঊর্ধ্বসীমায় মৃত্তিকাবর্তী কলরোল পৌঁছয় না। নিঃশব্দ সোনার ঢেউগুলো এগিয়ে এসে পড়ে তার দুচোখে। তারপর নিভে যায়।

বৃন্দার মুখ মর্মরের স্তব্ধ রেখায় বাঁধা। যেন সে কিছু দেখে না, কিছু খোঁজে না। কিন্তু সে জানত সন্ধ্যার মত এত নিরাশ্রয় ভাব কোনদিন আসে নি। মুকুন্দ দোকানের দরজা টেনে দিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। বৃন্দা সিঁড়ির ক ধাপ উঠে কবাট আলগা করে দেখল ভিতরে অন্ধকার। প্রথমে ভাবল কোণ থেকে দেশলাই খুঁজে এনে বাতি জ্বালবে। তারপর কি ভেবে সে খোঁজাখুঁজি করল না। মুকুন্দর মূর্তিটা পড়ে ছিল টানটান হয়ে মুড়ি দেওয়া। হয়ত মৃতের চেহারার অনুরূপ। কিন্তু বৃন্দার মনে হয় না তা। সে জানে কি করে তা সঞ্জীবিত করতে হয়। তা তার পাথরের বুকের শীতল নগ্নতার নীচে গোপন। তা শান্ত, প্রফুল্ল, রাতের গায় হেলে থাকা সৌরভের মত। তার একটি স্পর্শে প্রাণ পায় অগ্নিশিখা। সে জ্বালাবে, অন্তরের চেলিবন্ধন পরাবে। কালকে মণ্ডিত করবে অনন্তে। সে তার শুচিশুদ্ধ প্রণয় অমৃতবিন্দুতে ঢালবে জরার ছন্নাধারে।

কাঁথার নীচে যেখানটা মনে হচ্ছিল তার মাথা তার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে মুখ নামিয়ে এনে বৃন্দা ডাকল,—মুকুন্দদাদা।—

—কে!—মুখের ঢাকা টেনে সরিয়ে ফেলে চাইল মুকুন্দ।

—আমি বিন্দা।—একটা হাত মুকুন্দর শুভ্র তুষার চুলগুলোর উপরে বুলিয়ে আস্তে আস্তে সমান করে দিতে দিতে জবাব দিল বৃন্দা।

—বিন্দা, তুমি, আইলা এখন,—মুকুন্দ বৃন্দার অন্ধকারে প্রস্ফুটিত মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে বলল,—এখন সাঁজ পাইরাই বুঝি রাত আইছে—

—মুকুন্দদা, ওঠ। এখন রাতই বটে। চল, তুমি যে বলেছিলে আমায় সঙ্গে করে আবার যেতে পার অনেক জায়গায়। চল তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে। আমি যেতে এসেছি।

মুকুন্দ সম্পূর্ণটা বুঝতে পারছিল না। ঘরটার নিষ্প্রদীপ আবছায় উঁজিয়ে ঢুকছিল বাইরে আকাশের জ্যোৎস্না। মনে হয় দুটো জগতে সে একই সময় আছে। একটা অন্ধকারের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, যা বিষের মত অবশ করে রেখেছে; আরেকটা স্বপ্নের, বা স্বপ্নের মধ্যে নতুন জন্মলাভের, নতুন জাগরণের। আর সেই উজর আলোয় ঝাপসা স্মৃতির মত দেখাচ্ছিল বৃন্দার মুখ।

—ওঠ মুকুন্দদা। সে তার ডান করতলে তুলে নিল কাগজের মত খসখসে একটা শুকনো হাত। মুকুন্দ ধীরে ধীরে ওঠে। হঠাৎ অত্যন্ত হাল্কা মনে হল আপনার দেহের অনুভূতি, প্রাণ, সব কিছু। সে যেন ফিরে চলেছে বহুদূরে। নদীর দেশে। পাড় থেকে জেগে ওঠে মাস্তুলের অরণ্য। ধূসরিল নদীর বুক।

তারা দুজনে জড়ো করে গুছিয়ে ভর্তি করে মুকুন্দর কাঠের বাক্সটা। ঝালাই মেরামতির কতশত সাজ সরঞ্জাম। একটা ঝুড়িতে বাকি সব কিছু ভরে মাথায় করল বৃন্দা। মুকুন্দ এগিয়ে এসে দরজার কবাট খুলে তাকাল বাইরে।

গঙ্গাতীরে আজ রাতে কিসের উৎসব। দলে দলে মানুষ চলেছে। খোল আর খঞ্জনীর আওয়াজ কানে আসছিল। একটানা ছন্দে পড়ছিল অসংখ্য মানুষের পা। জ্যোৎস্নায় ধূয়ে যাচ্ছিল নগরের পথঘাট। জ্যোৎস্নায় নিবিড় হয়ে ছিল অন্ধকারের খাঁজগুলো। পরাগের মত তা বিছিয়ে পড়ে বৃন্দার চোখের পাতায়। ভীড় করা মানুষের প্রবাহটা মনে হয় অনন্ত।

বৃন্দা ঝুড়ি মাথায় করে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। তারপর কাঠের বাক্সটা একহাতে কাঁধে ধরে মুকুন্দ নামল আস্তে আস্তে। পা দুটো সামান্য কেঁপে যায়। তার মনে পড়ল অনেক পুরোনো কথা। একবার চলমান জনস্রোতের একটু তফাতে তারা মুহূর্ত কয়েক থেমে চেয়ে রইল। তারপর পিছনে বৃন্দাকে নিয়ে মুকুন্দ এগিয়ে চলল ভীড়ের মধ্য দিয়ে। তার পায়ে ছিল অনেক দূরের পথের স্বপ্ন।

বৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ

অশোক মিত্র

একটি ভক্তিবাদী উক্তি দিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি : গত দশ বছরে ধান্যে-শিল্পে-পুষ্পে আমরা যতটুকু এগিয়েছি, স্খলন-পতন না-ঘটলে তার চেয়ে বহুগুণ দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম দুই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান এবং জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা। আর্থিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা, পরিমাপ ও বিন্যাস নিয়ে যে ধরনের পরিশীলিত আলাপ ইদানীং আশে-পাশে হ'তে শুনি, দশবছর আগে তা অভাবনীয় ছিল। আলোচনা-চিন্তা-বিশ্লেষণের এই উন্নত মান থেকেই মাঝে-মাঝে আশা হয়, আপাতত আমরা তেমন দ্রুতসঞ্চারী যদিও নই, খুব ক্ষতি হয়নি তাতে : উন্নতির পিপাসা যেখানে এত তীব্র, ভুলভ্রান্তির পাহাড় পেরিয়ে শিগ্গিরই সেখানে উচ্ছল প্রগতির প্রবাহমানতা দেখা দেবে।

ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সূত্রই হলো এবংবিধ আশাপোষণ : যা আশা করা যায়, স্রেফ আশা করার ফলেই অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয়। লোকে যদি বলাবলি করতে থাকে এটা ঘটবে, আবহাওয়ার সুর অন্যরকম হয়ে যায় তাতে, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় চারিদিকে, এবং এ-উৎসাহ থেকেই এমন কার্যপরম্পরা সৃষ্টি হয় যে যা হ'লে ভালো হতো মনে হয় সেটাই ঘটে যায়। সুতরাং দেশের দ্রুততর আর্থিক প্রগতির জন্য আশা-পোষণ আমাদের কর্তব্য। তবে 'আমরা চমৎকার উন্নতি করছি, খুবই ভালো করছি, যারা বলছে আমরা তেমন এগোচ্ছি না তারা বিশ্বনিন্দুক' এসব মন্ত্র না-আউড়ে যদি আর্থিক বৃদ্ধির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সজাগ করার চেষ্টা চলে, তাহলেই মহত্তম মঙ্গল। বিশ্লেষণ থেকেই বিবেচনা আসে, এবং বিবেচনা পরিপক্ক হ'লে কাজকর্মেও স্বতই দক্ষতা বাড়ে। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রগতির প্রধান সূত্রগুলি নিয়ে সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু-কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করা হচ্ছে।

সব কথার গোড়ার কথা বিনিয়োগ, এবং বিনিয়োগের হার। সঞ্চয়, এবং সেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ : উৎপাদনের সঙ্গে এদের কার্যকারণ সম্বন্ধ। জাতির যা সামগ্রিক উৎপাদন, বর্তমান মুহূর্তে তা পুরোপুরি উপভোগ না করে কিছু-কিছু যদি সঞ্চয় করা যায়, সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি-কলকারখানার ব্যবস্থা একদিকে যেমন সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, যানবাহনের বিস্তার, বিদ্যুৎসরবরাহের পত্তন, ঘরবাড়ি-দালানকোঠার প্রসারও সম্ভব। ইত্যাকার নানা আয়োজনের ফলে জাতির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে চলে। যত বেশি সঞ্চয়, তত বেশি বিনিয়োগ, অতএব তত বেশি উৎপাদন। সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হারের সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির নিবিড়তম যোগ।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবশ্য একটু ঢিলে দিলে ক্ষতি নেই : বিনিয়োগের হার ধীর হয়ে এলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার অবশ্যই কমে আসবে, কিন্তু সমুৎপন্ন সর্বনাশের সূচনা নেই তাতে, একবছর দুবছর বৃদ্ধির হার সামান্য নেমে এলেও জীবন-যাত্রার সমস্থ মানের খুব হানি হবে না তাতে। অন্য দিকে গরিব দেশের পক্ষে উচ্চহারের

বিনিয়োগ ছাড়া উন্নতির অন্য পন্থা নেই। বিনিয়োগ না-বাড়ালে উৎপাদনশক্তি বাড়বে না, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার এগোবে না, যে-তিমিরে আছি সে-তিমিরেই থেকে যাবো। ঢিলে দেওয়া মানেই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা। যদি তা না চাই, সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

এখানে তাই একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়তে হয় : যে-দেশ যত গরিব তার সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হার তুলনায় তত বেশি হওয়া প্রয়োজন। অথচ, অন্য পক্ষে, দরিদ্র দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, অধিকাংশ লোক কোনোক্রমে খেয়ে-পরে আছে, তাদের সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে বলা পরিহাসের মতো ঠেকতে পারে। এই দ্বন্দ্বের দু'রকম মীমাংসা হ'তে পারে : এক, অনেক দরিদ্র দেশেই ধনবণ্টনের প্রচণ্ড অসাম্য; অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী এক শ্রেণী, যাঁরা হয়তো দেশের পুরো জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতকরা, জাতীয় আয়ের পুরো এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তারো বেশি উপভোগ করছেন। জাতির সামগ্রিক সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হ'লে অতএব এই ধনীশ্রেণীর উপর বেশি মাত্রায় কর বসাতে হবে। সামর্থ্যের মাত্রা অনুযায়ী এমন-এক করব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়তো সম্ভব যার ফলে দেখা যাবে দরিদ্রতর শ্রেণীদের উপর চাপ তুলনায় কম পড়েছে, বড়োলোকদের উপর বেশি পড়েছে, এবং হরে গড়ে এমন দাঁড়িয়েছে যে জাতীয় সঞ্চয়ের হার আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। বিকল্প যে-মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সঞ্চয়ের মাত্রা স্থির রেখে বিদেশ থেকে পুঁজি এনে বিনিয়োগ বাড়ানো, অর্থাৎ কিনা অপরের সাহায্যে নিজেদের উৎপাদন শক্তির প্রসার করা। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে : সুবিধে এই যে নিজেদের অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয় না, অন্যের উদ্বৃত্ত অর্থে চটপট জাতীয় উন্নতির ব্যবস্থা করা যায়। অসুবিধের দিক হলো যেখানে সঞ্চয়ের জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হচ্ছে না, হাত বাড়ালেই বিনিয়োগের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে দ্রুত উন্নতির জন্য প্রয়োজনানুগ মানসিক প্রস্তুতি হয় না, কাজ চলে অনেক সময়েই ধীরগতিতে : সস্তায়-পাওয়া টাকার অপচয়ের আশঙ্কা অনেকটাই বেশি। তাছাড়া বিদেশে হাত পেতে টাকা নিলে তার রাজনৈতিক কতগুলি কুফল তো আছেই।

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা : কোনো-কোনো দেশে খাঁটি সমাজতন্ত্র, অনেক দেশে পাঁচমিশেলি ধনতন্ত্র, এমনকি কয়েকটি দেশে সনাতন মালিকানা ব্যবস্থা। যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদের জাতীয় উন্নতির হার অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এটাও এক-হিসেবে খুব ধাঁধা-লাগানো ব্যাপার। প্রথম বিচারে মনে হবে যেখানে ধনতন্ত্র প্রবল, সেখানেই সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের মাত্রা বেশি হওয়া উচিত। ধনতন্ত্রবাদের গোড়ার কথাই হলো লাভ এবং লাভের হার, এবং লাভ বেশি হওয়া মানেই তো সঞ্চয় বেশি হওয়া। তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতায় ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে?

কারণ সোজা। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সব-ক'টি দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা অসম্ভব রকম কেন্দ্রীকৃত। তাছাড়া, কেন্দ্রে যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে আছেন, বিনিয়োগের হার বাড়ানো তাঁদের প্রায় প্রধানতম কর্তব্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজটা খুবে এলো-মেলোভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগের উপর তার গতিপ্রকৃতি, সুতরাং মাঝে-মাঝে ক্লান্তির ঢল নামলে বিনিয়োগেও ভাটা আসে। এই অনিশ্চয়তা থেকে সমাজতন্ত্র মুক্তি লাভ করেছে। যাঁরা হাল ধরে আছেন বিনিয়োগ, ও সেই সঙ্গে জাতীয় আয়ের হার, বাড়ানোর জন্য তাঁরা তৎপরতম। এমনও হওয়া সম্ভব বিনিয়োগের মাত্রা কমে এলে তাঁদের

কাজই চলে যাবে, সুতরাং শ্লথগতি হবার উপায় নেই। তাছাড়া, যেহেতু রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবার ফলেই এই সব-কটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, সম্পত্তিব্যবস্থার সম্পূর্ণ উৎখাতও সম্ভব হয়েছে সেই সঙ্গে, সম্পত্তি থেকে আয়ও তাই নিশ্চিহ্ন। শ্রমিকশ্রেণীর জীবিকার উদ্বৃত্ত যে-সম্পদ আগে ধনীশ্রেণীর বাসনে ব্যাপৃত হতো, তার পুরোটাই এখন বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব।

অবশ্য এটা মানতেই হয় শুরুতে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুব বেশি নয়। জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট সংকুচিত করে এনে সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির যজ্ঞে নিবেদন করলেও এমন হয়তো হবে যে বিনিয়োগের হার এরূপ যে কিছু-কিছু শিল্পের সূচনা সম্ভব, কিন্তু খুব বেশি নয়। হয়তো শিল্পের বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েও জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে ধরতে পারছে না, অতএব কৃষিকর্মে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ক্রমশ আরো একটু বাড়ছে। যারা কালকারখানায় ঢুকতে পারছে না তারাই গ্রামে পড়ে থাকছে, কিন্তু নামে-কৃষিরত লোকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও তাতে কাজে কৃষির উৎপাদন বাড়ছে না। যদি এমনও হয় যে বিনিয়োগের ফলে শিল্পে নতুন-নিয়োজিত লোকের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে, তাহলেও প্রধান সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, কারণ কৃষি এবং কুটিরশিল্পে ভিড়-করে-থাকা লোকদের উৎপাদনক্ষমতার দ্রুত উন্নতি না-ঘটলে জাতীয় আয়ের হার তেমন বৃদ্ধি পাবে না।

দ্রুত আর্থিক উন্নতি চাইলে বিনিয়োগের পরিমাপ বাড়াতে হবে, অর্থাৎ কিনা জাতীয় উদ্বৃত্ত বাড়াতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তবৃদ্ধি অনেকগুণ সহজতর। আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে গড়পড়তি উৎপাদনও বেড়ে চলে : বাড়তি উৎপাদনের সামান্য এক-অংশ বাড়তি উপভোগের জন্য বরাদ্দ করে বাকিটা বিনিয়োগের হার বাড়ানোর কাজে লাগানো তাই সম্ভব। এভাবে ক্রমশ বিনিয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে আর্থিক প্রগতির হার তীব্রতর করে তোলা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হামেশাই হচ্ছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে গোলমাল যে দেখা দেয় না তা নয়। যদি উপভোগের মান অদৌ বাড়তে দেওয়া না হয়, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে : পূর্ব ইওরোপের গোলো পনেরো বছরের ইতিহাসে এরকম অসন্তোষ বেশ-কয়েকবারই মাথা তুলেছে। তবে একটু সাবধানে এবং বিবেচনার সঙ্গে এগোলে সন্তোষ-ও-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু একটা মীমাংসা করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে লাভের মাত্রা বেড়ে যায়, এবং যেহেতু লাভের সম্পূর্ণটাই রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে, তার এদিক-ওদিক হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। লাভের কতটা পরিমাণ পুনরায় বিনিয়োগে খাটানো হবে কর্তৃপক্ষ সচ্ছন্দে তার স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন, এবং সে-নির্দেশ কার্যকরী হতে অন্য কোনো বাধা অনুপস্থিত।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অবশ্য উচ্চমানের বিনিয়োগের ফলে উচ্চমানের লাভ সম্ভব হয়ে থাকে, কিন্তু মুশকিল হলো এই উঁচু লাভের বেশ-একটা অংশ উপভোগে ব্যয় হয়ে যায়। লাভ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনীশ্রেণীর বাসনের পরিমাণ ঈষৎ বাড়ে। শিল্পপতিদের উপভোগের মাত্রা বাড়লে সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে দিতে হয়। সব-মিলিয়ে এমন দাঁড়ায় যে লাভের পরিমাণ যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার বড়ো জোর অর্ধেক কিংবা তারো কম বিনিয়োগে ব্যবহৃত হতে পারে। বিনিয়োগের মান পিছিয়ে থাকে, অতএব ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রগতির হার কিছুতেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৃদ্ধির হারকে ছুঁতে পারে না।

ইতিহাসের লীলাই এমন বিচিত্র। সনাতন মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে মানতেই হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের সুযোগসুবিধে হাজারগুণ বেশি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের প্রণালী আরো অনেক সুষ্ঠু, অনেক দ্রুততর। প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়তম ব্যাপার হলো বিনিয়োগ, সুতরাং অনুন্নত যে-সমস্ত দেশে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদেরই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। উদ্বৃত্তের বিশ্লেষণ থেকেই তত্ত্বটি ধরা পড়ে, খুব শাদামাঠা হলেও খুব অর্থঘন এই তত্ত্ব।

অবশ্য আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত অনেকগুলি নতুন প্রশ্ন এনে জড়ো করে। যদি দ্রুত প্রগতির জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎকর্ষ সর্বস্বীকৃত হয়ে পড়ে, তাহ'লে আগামী দু'-তিনদশকের মধ্যে এমনটা হয়তো হবে যে অধিকাংশ দরিদ্র দেশেই কোনো-না-কোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ইওরোপ, সেই সঙ্গে যদি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, পশ্চিমের অত্যুন্নত রাষ্ট্রগুলির কী হাল হবে তাহ'লে? এ-বিষয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

আর্থিক বৃদ্ধির হার খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। এক-হিশেবে পৃথিবীর সব দেশকেই অনুন্নত বলা চলে, কারণ সর্বত্রই দ্রুততর আর্থিক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত সামূহিক বৃদ্ধির হার দ্রুততর করা চলে; জীবনযাত্রার মান মার্কিনদেশে বাড়ছে সেটা ঠিক, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাপ সম্ভাব্যতম হারের অনেকটাই কম।

উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে এদিক থেকে যদি পার্থক্য টানতে হয় তাহ'লে বলতে হয় প্রভেদটা ইচ্ছার, দৃষ্টিভঙ্গির : যেসব দেশে প্রগতির হার বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অতএব উপভোগের তুলনায় বিনিয়োগের হার বাড়ানো প্রয়োজন এমন বিবেচনা করা হয়েছে, সেসব দেশ অনুন্নত। যেসব দেশে এরকম তাগিদ নেই, এবং বিনিয়োগের উপস্থিত হার পর্যাপ্ত বলে ধরা হয়ে থাকে, তারাই উন্নত। যে-সমস্ত দেশকে বর্তমানে উন্নত বলা হয়, তাদেরও অবশ্য অতীতে কোনো-একটা-সময়ে পাঁড়নের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, উপভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে বিনিয়োগের হার বাড়াতে হয়েছে, উন্নতি সম্ভব হয়েছে সেজন্যই। এখন যেহেতু তারা সচ্ছল, বিনিয়োগের হার আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই : জাতীয় আয়ের শতকরা বারো থেকে পনেরো পর্যন্ত বিনিয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই হার অটুট রাখলেই যথেষ্ট। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ থেকে দশের মধ্যে, সুতরাং তাদের আপাতত বেশ-কিছু কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

উন্নত দেশগুলিতে যে-সংকট দেখা দিতে পারে তা কৃচ্ছ্রতার সংকট নয়, পর্যাপ্তির সংকট। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে *New Yorker*-পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছিল, তাতে দুই মার্কিন শিল্পপতির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে : 'You don't like tailfins, I don't like tailfins, but what will happen to the American economy if nobody likes tailfins?" এই আর্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সংকটের স্বরূপ চমৎকার ফুটে বেরিয়েছে।

সমস্যা কোথায়? পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, জীবন-যাত্রার মান বেড়ে-বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে-যে লোকের নতুন তৈজস কেনবার ইচ্ছায় অবসাদ নেমেছে। উৎপাদনক্ষমতা তুঙ্গ শীর্ষে উঠেছে, ফলে বছরে বিভিন্ন ধরনের যত

জিনিশপত্র উৎপন্ন হচ্ছে, আনুপাতিকভাবে লোকের কেনার উৎসাহ তত বাড়ছে না। একমাত্র খাদ্যদ্রব্যই প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিতমনে উৎপন্ন করা চলে, কারণ ন্যূনতম পরিমাণ খাবার লোকেদের বাঁচতে হ'লে দরকার হবেই। কিন্তু খাদ্যগ্রহণের একটা উর্ধ্বতম সীমাও আছে, লোকের আয় যতই বাড়ুক, আনুপাতিক হিশেবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে না, এক-জায়গায় থামতে হবে। তাই জাতীয় আয় যতই বাড়ে, সামগ্রিক উৎপাদনে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের, এবং সামগ্রিক উপভোগে আহার্যের, অনুপাত ক্রমেই কমে আসে। অন্যপক্ষে উৎপাদনে খাদ্য-ব্যতিরেক অন্যান্য জিনিশের অনুপাত জাতির আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুস্কিল হলো এসমস্ত জিনিশই খুব চট করে ক্ষয়ে যাওয়ার মতো নয়, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত প্রতিবছর সমস্ত-কিছু নতুন করে তৈরি করতে হয় না। গাড়ি, বাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, ঘরের টেবিল, আকাশের উড়োজাহাজ ইত্যাদির আয়ু তো আরো অনেক বেশি।

সংকট অতএব এখানে : মার্কিন দেশে যত পরিমাণ সুস্থ-সমর্থ লোক, তারা সপ্তাহে পাঁচদিন করে কাজ করলে বাৎসরিক উৎপাদন যতটা হয়, বৎসরে নতুন চাহিদার পরিমাণ তার থেকে কম হলেই মুস্কিল। চাহিদা কম হ'লে নতুন তৈরি তৈজস বিক্রি হবে না, দোকানে-গুদোমে বোঝাই হ'তে থাকবে, ফলে পরের বছর উৎপাদনের পরিমাণ আরো কমিয়ে আনতে হবে, সুতরাং, কিছু লোককে ছাঁটাই করতে হবে, তাতে সামগ্রিক আয় সংকুচিত হবে, সুতরাং জিনিশপত্রের চাহিদা আরো-একটু কমবে, আরো লোক ছাঁটাই হবে, উৎপাদন আরো নেমে যাবে, এমন ভাবে চক্রাবর্ত হারে জাতির আর্থিক অবনতি হ'তে-হ'তে একদিন পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে।

খুব সংক্ষেপে সংকটের সম্ভাব্য রূপ বর্ণনা করা হলো। অবশ্য পশ্চিমের সব-ক'টি দেশেই একসঙ্গে-যে এধরনের সংকট দেখা দিতে পারে তা আদৌ নয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির জীবনযাত্রার মান এখনো অনেক পিছিয়ে আছে, চাহিদায় মন্দা আসতে তাই এখনো বহুদিন বাকি। মার্কিন দেশেও সমাজের সবশ্রেণীর সমপরিমাণ আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নেই, তবে সংকটের লক্ষণগুলি কয়েক বছর ধরে প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। লোকের জিনিশ কেনবার ইচ্ছায় যাতে ভাঁটা না-আসে, সেজন্য প্রতিবছর পুরোনো তৈজসে একটু-আধটু অদলবদল ক'রে নতুন উৎপাদন বাজারে ছাড়া হচ্ছে। একটি পরিবারে দুটো-তিনটে ক'রে গাড়ি না-থাকলে গাড়ির ব্যবসায় সংকট দেখা দেবে, আবার প্রতি দু'তিন বছরে গাড়ি না-পাল্টালেও সংকটের আশঙ্কা। কিন্তু লোকাচরণ পরীক্ষা ক'রে মনে হয় জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, ঘন-ঘন গাড়ি বদলানোতে তেমন যেন আর রুচি নেই। এরকম রুচিবিকার খুব বেশি পরিমাণে, বহুবিধ শিল্পের ক্ষেত্রে হ'তে থাকলেই আর্থিক সর্বনাশ। বছর-বছর তাই গাড়ির চেহারা আকার ইত্যাদি ঈষৎ ওলট-পালট করা হচ্ছে, রেডিওগ্রামের শব্দসম্ভার নিয়ে অহরহ নতুন নিরীক্ষা হচ্ছে, লোককে ইচ্ছা-বাসনা-কামনার নতুন-নতুন মহলে বন্দী করার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। আরো যা আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে তা সর্বপ্রকার পণ্যের অবক্ষয়ের মাত্রা বাড়ানোর। মাত্র-কয়েক বছরের পুরোনো ঝকঝকে নতুন রাস্তা বা সাঁকো ভেঙে ফেলে ফের নতুন উদ্যমে নির্মাণের কাজ চলছে, দশ-বছর আগে তৈরি বাড়ি আগাগোড়া সংস্কার করা হচ্ছে। যে-জিনিশ—হোক তা রান্নার বাসন, হোক তা মেঝের গালিচা—আরো বেশ-কয়েক বছর চমৎকার ব্যবহার করা চলতো, তা বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন-একপ্রস্থ জিনিশের ব্যবস্থা হচ্ছে। এভাবে তৈজসপত্র পাল্টানোর কোনো

ব্যবহারিক কারণ নেই, একমাত্র সামাজিক অনুশাসনেই এই আপাত-অপচয় সম্ভব হচ্ছে। অবক্ষয়ের পরিমাপ না-বাড়ালে আর্থিক সংকট রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না, অতএব অপচয়েরই আশ্রয় নিতে হবে, অন্যথা মার্কিন সমাজের উপায় কী?

শিল্পোন্নত দেশের প্রধান মাথাব্যথা, তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগের হার বাড়ানো নিয়ে নয়, হার যাতে না কমে তা-ই হচ্ছে মূল সমস্যা। মার্ক্স থেকে শুরু করে রোজা লুক্সেমবর্গ, লেনিন প্রভৃতি অনেকেই অবশ্য ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ নিয়ে তত্ত্ব বিস্তার করে গেছেন। হালে যা ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে তা মনীষীদের প্রাগুক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যদিও সবক্ষেত্রে নয়। মার্ক্সবাদীদের বক্তব্যের প্রধান সূত্র ধনতন্ত্রে সংকট অপ্রতিরোধ্য কারণ এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে শ্রমিক উপার্জনের হারবৃদ্ধির কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। যদি দুটো হার সমান্তরাল গতিতে বাড়তে পেতো মুস্কিল আসান হতো; কিন্তু মার্ক্সীয় মনীষীদের বিচারে এধরনের সমান্তরালতা ধনতন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

উপরোক্ত দুটো হারের মধ্যে পরম্পরা না-থাকলে কী ঘটবে তার তিনটি ব্যাখ্যা তত্ত্বে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে হ্রস্ব উপভোগ তত্ত্ব। ধনতন্ত্রে উৎপাদনশক্তি ক্রমাগত বাড়ছে, সুতরাং তৈজসের চাহিদা না-বাড়লে মুস্কিল। কিন্তু শিল্পপতিরা এতই অবোধ যে শ্রমিক-শ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার সামান্য পরিমাণও বাড়াতে তাঁরা অনিচ্ছুক। যেহেতু দেশের অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী, তাদের উপার্জন না-বাড়লে জিনিশ কেনবার চাহিদাও বাড়ে না। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে ধনতন্ত্র ধ্বস্বিত্ত হতে বাধ্য।

অন্য-এক ব্যাখ্যায় উৎপাদানাধিকার প্রসঙ্গে না-গিয়ে লাভের হারের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। শিল্পপতিদের প্রধান লক্ষ্য হলো লাভের হার, তাঁদের মতে যেখানে লাভ নেই, সেখানে বিনিয়োগও অর্থহীন। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা হিশেব করে দেখিয়েছেন ক্রমাগত বিনিময়ের ফলে পুঁজি যে-পরিমাণ বাড়ে জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না, অতএব লাভের হার কমতে থাকে। এই হার যেদিন শূন্যের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, সেদিনই ধনতন্ত্রের কথাটি ফুরোবে।

সর্বশেষ ব্যাখ্যায় ধনতন্ত্রের সমাপ্তি রক্তাক্ত বিপ্লবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। লোকনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে বেকার সমস্যার নিরসন হয়। এমন অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করে। পারিশ্রমিকের হার খানিকটা অবশ্য বাড়ে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ধনপতিরা শিল্প-কৌশলের উন্নতিসাধন করে লোকনিয়োগ সংকুচিত করে আনেন, ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থা একই রকম থেকে যায়। এভাবে কিছু দিন চলবার পরে অহিংস আন্দোলনে অশ্রদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, ধনতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে চুরমার করে দেবে, এরকম আভাস মার্ক্সীয় বিচারে সোচ্চারিত।

এই তিন ব্যাখ্যাতেই উজ্জ্বল আলোকপাত আছে, তবে পশ্চিমের দেশগুলিতে ধন-তন্ত্রের বিবর্তন একটু অন্যরকম হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার ঠিক এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি, যে-গতিতে উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে অবশ্য শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যই। কিছুটা চতুরালির সঙ্গে এমনও আজকাল বলা হয়ে থাকে : পশ্চিম ইওরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হবার জন্য মার্ক্স নিজেই দায়ী। মার্ক্সপন্থী রচনা

ও ভাবধারা থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে উনবিংশ শতকে শ্রমিক-আন্দোলনে দানা বাঁধে, ক্রমশ তা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে শ্রমিকদের আপেক্ষিক অবস্থার অবনতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আপাতত অসম্ভব। অর্থনৈতিক কাঠামো এসব দেশে এখন যা রূপ নিয়েছে, শ্রীমতী জোন রবিনসনের ভাষায় তা a world of monopolies, সম্প্রতি অধ্যাপক গলব্রেথ এই ব্যাপারটাকেই concept of countervailing power হিশেবে দেখেছেন : একদিকে শিল্পপতিদের জোট, অন্যদিকে শ্রমিকদের সংস্থা, মাঝখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, দেশের উৎপাদন কীভাবে কোন্ অনুপাতে বিতারিত হবে তা এই তিন দানবের পারস্পরিক বোঝা-পড়ায় স্থির হচ্ছে। শ্রমিকরা আজকাল তাই ধনতান্ত্রিক সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে ধনতন্ত্রের যে ক্রমবিলোপ কল্পনা করা হয়েছে, পশ্চিমের দেশগুলিতে সেরকম হয়তো হবে না। তবে সংকটের সম্ভাবনা এখনো যথেষ্ট, এবং উৎপাদনাধিক্য থেকেই ভয়। মার্কিন দেশে যা হচ্ছে, লোকের নতুন তৈজস আহরণে অবসাদ, তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজেও সংক্রামিত হতে বাধ্য। এই সর্বনাশ ঠিক এক-বছর দু-বছরে হবে না, আস্তে-আস্তে নিস্পৃহতর আপাতবিষ ধনতন্ত্রের স্নায়ুকে নির্জীব করে আনবে। তাই মার্ক্স যা বলে-ছিলেন তা-ই হয়তো ঘটবে, যদিও ঠিক যেভাবে ঘটবে বলে উনি ভেবেছিলেন প্রকৃত প্রণালী তার থেকে সামান্য স্বতন্ত্র হবে।

অবশ্য যে-সংক্রান্তি আজ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, অনেক সময় কর্মচক্রে তার গতি অন্যরকম হয়ে যায়। সুতরাং আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ পাবে এরকম প্রকট উক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা না-রাখাই ভালো। কারণ, ধনতন্ত্রের পক্ষেও, হয়তো এখনো সময় আছে, এখনো উপায় আছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহলেই ক্রান্তিকাল আরো কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকতে পারে। মার্কিন জনসংখ্যার এক-দশমাংশের উপর নিগ্রো, এবং অধিকাংশেরই হতদীর্ণ অবস্থা। নিগ্রো সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ আয়োজন করলে পরিণামে সমগ্র মার্কিন জাতিরই ভবিষ্যতে শুভ : সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র স্তরের উপার্জন বেড়ে গেলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে। চাহিদা যত বাড়বে, সংকট থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তত বেশি।

আর যা উপায় আছে তা বিলিয়ে দেওয়া। অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখতে হলে উৎপাদনের পরিমাণ অব্যাহত হওয়া চাই। যে-পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, নিজেরা তা যদি পুরোপুরি ব্যবহার করতে না চাই বা না পারি তাহলে সর্বনাশ এড়াবার চমৎকার পন্থা প্রতি-বেশীকে ডেকে হাতে-ধরে দিয়ে দেওয়া একটু আগে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের হার ক্ষিপ্রতর, অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রগতির সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রেই তাই সবচেয়ে বেশি। এরকম প্রলোভনে পড়লে অনেক দেশই হয়তো আগে-পরে সমাজতান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানেও কোন অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি, নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার উদ্দেশ্যেই, যদি যন্ত্রপাতি এবং উন্নতি-সহায়ক অন্যান্য জিনিশপত্র নিয়মিত গরিব দেশগুলিতে পাঠাতে শুরু করে, তাহলে আমাদের স্বকীয় সঞ্চয়ের হার কম রাখলেও চলে। যদি দ্রুত উন্নতির জন্য জাতীয় উপার্জনের শতকরা পনেরো ভাগ বিনিয়োগে লাগাবার দরকার মনে হয় তাহলে আমরা নিজেরা শতকরা দশ-ভাগের মতো সঞ্চয় করতে পারি, শতকরা বাকি পাঁচ ভাগ বাইরে থেকে আসতে পারে। তাতে আমাদের যেমন সুবিধে, পশ্চিমের দেশগুলিরও তার চেয়ে কিছু অংশে কম নয়, কারণ

তাদের মরণ-বাঁচনও উৎপন্ন তৈজসের সুষ্ঠু বিতরণের উপর নির্ভর করছে।

অতএব ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস এখনো হয়তো ঠেকানো যায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা, ঔদার্য, ভবিষ্যৎদৃষ্টি। একটিলে দুই পাখি মারা যাচ্ছে, আত্মবিলোপের আশঙ্কা রোধ করা হচ্ছে, অন্য দিকে দরিদ্র দেশগুলিকে বিনিয়োগে সহায়তা করে সমাজতন্ত্রের প্রলোভন থেকে তাদের সরিয়ে আনা যাচ্ছে : পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহে এই প্রতীতি ছড়াতে আরো অনেক সময় নেবে। তাছাড়া, সব গরিব দেশই যে পশ্চিম থেকে বিনিয়োগপণ্য হাত পেতে নিতে সম্মত হবে তা নয় : আত্মসম্মানের ব্যাপার আছে, বিদেশী মূলধন থেকে অনেক সময় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে চায়, সেদিকটাও ভেবে দেখবার আছে।

বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া এবং গতি-প্রকৃতির উপর তাই পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। এমন না-হলেই আশ্চর্য হতে হতো : কারণ কে কেমন-ভাবে খেয়ে-প'রে আছে বা থাকতে পারে তা-ই পৃথিবীর প্রধান সমস্যা। আদিম মানুষের সময়ে যা ছিল, এখনো তাই : সমস্যাটি ইতিমধ্যে জটিলতর হয়েছে এইটুকু যা তফাৎ।

রীতিমতো গল্প

অমিয়ভূষণ মজুমদার

গজেন্দ্র পুতুতুণ্ড আমাকে এই গল্পটা বলেছিলো।

গজেন্দ্রর চেহারাটা মনে হ'লেই আমার হাসি পায়। কালো, যাচ্ছেতাই রকমের মোটা। মোটা পেটের উপরে যখন সে ক্রশবেল্ট আঁটে তখন সে বেল্ট কখনও যথাস্থানে থাকে না। হাসতেও পারে লোকটা, আর হাসির পরেই বেল্টটা খুলে ঠিক ক'রে পরতে হয় তাকে, কারণ যদিবা তার আগে বেল্টটা কোন রকমে ভুঁড়ির উপরে ছিলো হাসির দমকে সেখানে যে কাঁপন লেগেছিলো তাতে বেল্টটা ভুঁড়ির নিচে নেমে গিয়েছে।

কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে যে দু'চারজনকে আমি ভালোবাসি সে তাদের মধ্যে একজন। প্রায় সাত আট বছর পরে সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। দেখলাম তার চুল পেকেছে, গালের মাংস অনেকটা ঝ'রে গিয়েছে কিন্তু দেহের মাঝামাঝি জায়গায় তেমনি বাড়বাড়ন্ত। আর হাসি? সেটা একটুও বদলায় নি। বিস্ময় লাগলো লোকটা এই হাসি নিয়ে পুলিশের চাকরি করে কি ক'রে।

গজেন্দ্র বললো,—চলো, মোহিত, একটু খাওয়াদাওয়া করা যাক। এই ব'লে সে ফাঁদলের মধ্যে দিয়ে গ'লে যাবার ভঙ্গিতে বেল্টটাকে তুলে ভুঁড়ির উপরে স্থাপন করলো।

বললাম,—খাওয়া দাওয়া, মানে চা?

—তা আবার কবে থেকে হ'লো। তবে তোমরা লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ।

এর পরে কি ক'রে তার সঙ্গে একটি নাম করা হোটেলে গিয়ে পৌঁছালাম, কি ক'রে সে ডিনারের অর্ডার দিলো, এসবই যেন পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার।

ডিনারের কিছু দেরি হবে জানতে পারলাম। কি একটা কল বিগড়েছে রান্নাঘরে। আমরা লাউঞ্জে গিয়ে বসেছিলাম। সেখানে ব'সে আমরা যখন গল্প করছি তখন হঠাৎ একটা কুকুর সেখানে দেখা দিলো। জিভ লক্‌লক্‌, কান লট্‌পট্‌। হাল্কা হল্‌দে ছাই-রঙের ছোপ দেয়া লোমশ একটা প্রকাণ্ডতা। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমি কুকুর ভালোবাসি না। আমার গা শিরশির করে উঠলো। কিন্তু গজেন্দ্র যেন তার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু কুকুরটার মালিক বোধহয় রাস্তায় ছিল। সেটা এদিকওদিক ছোঁক ছোঁক ক'রে বেরিয়ে গেলো। আর যাবার সময়ে দরজার কাছে পা তুলে—

গজেন্দ্র (তার চোখ দুটি চক্‌ চক্‌ করলো) বললো, পেডিগ্রি ডগ্‌।

—কিন্তু ভদ্রতা জ্ঞান দেখলে তো?

—পেডিগ্রি ম্যান তো বলি নি।

এই থেকে ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্র পুতুতুণ্ডের গল্পটা সুরু হ'লো। যান্ত্রিক গোলযোগে যখন ডিনার একঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে, এবং যখন পুতুতুণ্ড তার পুলিশ সুলভ ভঙ্গিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে এই গোলযোগের পিছনে সাবোটাজ থাকতে পারে, আমি যখন আলাপটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই কাল্পনিক সাবোটাজের পিছনে যন্ত্রের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ কিনা এই গবেষণা করছি তখন গজেন্দ্র এই গল্পটা বলেছিলো। অবশ্য

সে বারবার, প্রথমে, শেষে গল্প চলার মাঝে মাঝেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো এটা নেহাৎ গল্পই, কিছুমাত্র সত্য নেই এতে, নায়ক নায়িকা সবই কাল্পনিক।*

গজেন্দ্র তখন ক-থানার অফিসার ইন চার্জ। মহকুমা বা জেলার সদর নয়। চারিদিকে চা বাগান। চা বাগান থেকে তাদের নিজস্ব রাস্তাগুলি বেরিয়ে যেখানে ন্যাশানাল হাইওয়েতে মিশেছে তার কিছুদূরেই থানা। থানার চৌহদ্দির মধ্যে চা বাগান ছাড়া আর যা আছে তা রিজার্ভ ফরেস্ট। সুতরাং বাসিন্দা বলতে চা বাগানের কুলি, কর্মচারী, ম্যানেজার, ফরেস্ট-বিভাগের কর্মচারী, দুচারজন কণ্ট্রাক্টর এবং তাদের খালাসি কিছু দোকানদার, ফরেস্টবিভাগ থেকে চাষ আবাদ করতে যাদের বসিয়েছে তেমন কিছু গরীব গৃহস্থ জংগলে জংগলে। আর সব রকমের সমাজেই কর্মহীন নোঙরহীন কিছু লোক থাকে—তাদের কয়েকটি। কিন্তু ইদানীং কিছু রকমফের হয়েছে। থানার এক্তিয়ারের মধ্যেই চা বাগানগুলো থেকে কিছুদূরে একটা কয়লার খনি আবিষ্কার হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে একটা নতুন ধরনের কিছু হবে তা বোঝা যায়। বিরাট আকারের ক্রেন ইত্যাদি আসতে আরম্ভ করেছে। একটা শ্রদ্ধা-সংযুক্ত বিস্ময় আকাশের গায়ে।

কিন্তু যেহেতু চা বাগানই এখানে সভ্যতার প্রতীক, থানার ঘরবাড়ি চা বাগানের ঘর-বাড়ির কায়দাতেই তৈরি। থানার ইন চার্জ, আর তার অধস্তন সাব ইনস্‌পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের জন্য কাঠের তৈরি বাংলো। কেবল থানার অফিসঘরটা লাল ইটের দেয়াল তোলা। সম্ভবত মাঝে মাঝে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করতে হয় ব'লেই কিছুটা দৃঢ়।

পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানুষ বাস করে সে সব জায়গাতেই কিছু সুবিধা এবং কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এখানেও ছিলো। অসুবিধা বলতে সিনেমা নেই, স্কুল, কলেজ নেই। সুবিধা বলতে থানার কাছেই একটা হাসপাতাল আছে—দু তিনটে চা বাগান মিলে যা চালায়। হয়তো সংস্কৃতির কোন কেন্দ্র ছিলো না, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোক খুব বেশি না থাকায় যে কজন ছিলো সকলেই পরস্পরের পরিচিত ছিলো। থানাতেও আড্ডা বসাতে পারতো। থানার টেবলে তাসখেলার রেওয়াজ ছিলো না এমন নয়।

থানার কাজের চাপও খুব বেশি ছিলো না। অপরাধ যা ঘটতো তা প্রায়ই মামুলী ধরনের। দুচারটে চুরি, দুচারটে ছিনতাই, মদ খেয়ে মাথা ফাটানোর ব্যাপার। দুএক ক্ষেত্রে ছোরাও মারা হয়, কিন্তু এ সবেরই একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। অপরাধী ধরার জন্য খুব একটা পরিশ্রমও করতে হয় না।

ভাগ্যই মানুষকে চালনা করে তার কর্মক্ষেত্রে, শুধু চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে নয়। গজেন্দ্রের বিশ্বাস এটা তার ভাগ্যই যে তাকে অন্য অনেকের চাইতে বেশি খাটতে হয়। কিন্তু ভাগ্যটা তার অবিমিশ্রভাবে খারাপ নয়। তদন্তে গেলে খাওয়াদাওয়াটা তার ভালোই হয়। কখনও কখনও বিলেতি মদের একটা বোতলও কোন কোন পার্টি তার সম্মুখে স্থাপন করে।

কাজেই সে থানায় আসবার এক মাসেই মধ্যেও যখন একটা খুন হ'য়ে গেলো। থানার খাতাপত্র থেকে সে জানলো গত চার বছরে একটা মাত্র খুন হয়েছে, আর সে আসতে না আসতে একটা ঘটে গেলো। তার অজান্তেই একটা ক্লান্তির দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, কিন্তু সে বিব্রত বোধ করলো না। তার অধস্তন সাব-ইনস্‌পেক্টর যোশেপ কুজুরকে তদন্তের ভার

* গল্পের ফুটনোট হয় না। গল্প মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তা হ'লেও এখানে বলা ভালো এ গল্পের সব কিছুই কাল্পনিক।

দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'লো। কারণ কুজুরের ভাগ্য গজেন্দ্রর ভাগ্যর চাইতে সদয় ছিলো। সে সদরে ব'সেই দু'একবার শুনেছে ক্রাইম-ডিটেক্‌শানে তার একটা পটু'তা আছে। কিন্তু সমশ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে এই দক্ষতাকে সৌভাগ্যের নিদর্শন ব'লে মানা হয়। সদরে ডি.এস.পি একবার কুজুর সম্বন্ধে বলেছিলো—লাকিডগ্। আর এটা কুজুর শুনেছিলো। সেজন্য কেউ তাকে লাকিডগ্ বললে সে সন্তুষ্ট হয়। সে নিজেও বিশ্বাস করে সে অনেক ব্যাপারেই সৌভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে।

শুধু ক্রাইম-ডিটেক্‌শান কেন অন্যান্য ব্যাপারেও তার সৌভাগ্য আছে। তার মেম-বউএর কথাই ধরো। তার গাউন পরা হাল্কা চেহারার ট্যাঁশ বউকে দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, অনেকেরই ঈর্ষা হতো। কুজুরের গায়ের রংও ফর্সা ছিলো। তার উপাধি যাই সূচনা করুক তার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে কোন রকমে পাহাড়ি রক্তের একটা ছোঁয়াচ ছিলো। কিন্তু তার বউএর রক্তে যে দু'চার পুরুষ আগেকার হ'লেও চা বাগানের সাহেবদের রক্ত মিশেছিলো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা বিষয় এ থেকে বেশ পরিষ্কার হয় এ থেকে যোশেপ এ অঞ্চলেরই অধিবাসী।

এই থানা না হ'ক, পাশের জেলার এমনি কোন চা বাগান অঞ্চল। এ অঞ্চলগুলো নৃতত্ত্বের আলোচনার দিক দিয়ে আকর্ষণীয়। সব সময়ে না হ'লেও মাঝে মাঝে নেপালি, ইউরোপীয়, মুণ্ডা ও মদেশীয়া রক্তের মিশ্রণ চলেছে এখানে। সংস্কৃতি ও ধর্মের নানা পরিবর্তন হচ্ছে। কুজুরের মেমবউ সম্বন্ধে অবশ্য দুটো কথা শোনা যায়—প্রথমত মিশ্রিত রক্ত হ'লেও তার মিশ্রণের উপাদানগুলি কুজুরের মিশ্রণের উপাদানের চাইতে দামি ছিলো। আর কুজুর পাহাড়ি শহরের মিশনারী কলেজে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ হ'লেও, দারোগার মতো সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও, এবং তার মেমবউ নিরক্ষরা হওয়া সত্ত্বেও, তার পক্ষে ওই মেমবউ পাওয়া ভাগ্যর ব্যাপারই। অবশ্য একথা জানতে কারো বাকি ছিলো না ব্যাপারটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড—মেমবউএর আগের স্বামী তাকে ডাইভোর্স করেছিলো ব'লেই।

সে যাই হ'ক কুজুরের ভাগ্য এই খুনের ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো। খুনী ধরা পড়লো। খুন যে বস্তিতে হয়েছিলো সেটা একটা চা বাগানের এলাকা। রাতারাতি বারো মাইল পথ ফরেস্টের মধ্য দিয়ে চ'লে খুনী তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলো। কুজুর লাশ চালান ক'রে দিয়েছিলো মোষের গাড়িতে কনস্টেবলদের খবরদারিতে। নিজে স্কুটারে ক'রে আসছিলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো অকুস্থলে যে খবর পেয়েছে সে সেটাকে যাচাই ক'রে দেখলে মন্দ হয় না। সত্যি কারো বোনের বাড়ি আছে নাকি তুংসুং বস্তিতে। বিশেষ ক'রে বস্তিটাকে যখন একটু ঘুরে গেলে থানায় ফেরার পথেই ছুঁয়ে যাওয়া যায়। সেখানে হরকামায়ার বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেলো, আর হরকা-মায়ার বাড়িতে তার ভাইকেও যে নাকি হত স্ত্রীলোকটির স্বামী। স্বামী মহাশয়ের অবস্থাও তখন ভালো নয়। সেও বিশেষ রকমে আহত, পুরু ক'রে ন্যাকড়া পোড়ানো ছাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করা হয়েছে মাত্র।

কুজুর তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—কি ক'রে সে এমন আঘাত পেলো?

তখন সে বললো আঘাত সে নিজেই করেছে নিজের শরীরে।

—কেন, তা করতে গেল কেন? আহা, খুব জখম হয়েছে তো! তখন সে স্বীকার করলো জনানাকে খুন ক'রে সে নিজেও মরতে চেয়েছিলো।

সুতরাং আর একটি মোষের গাড়ি ক'রে আহত স্বামীকে চালান ক'রে দিলো কুজুর,

থানা ঘুরে হাসপাতালে।

ঘটনাটা প্রেমঘটিত। গজেন্দ্র হাসপাতালে লাশ দেখতে গিয়েছিলো। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি নেপালি স্ত্রীলোক। স্বজাতীয় বাইরের রক্ত মিশ্রণের ফলে গায়ের রং কালো। নাকচোখেমুখে পাহাড়িভাবের সঙ্গে ওঁরাওদের আকৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কানের ভারি পিতলের গহনাই তাকে নেপালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু গজেন্দ্র এই স্ত্রীলোকটির প্রেমের ব্যাপারে খুন হওয়ার কোন কারণই দেখতে পেলো না। চ্যাপ্টা বুক, শীর্ণ উরু, নিতম্ববহীনা এই স্ত্রীলোকটি কি একই সঙ্গে দুটি পুরুষকে উন্মত্ত করতে পেরেছিলো। একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়, যদি সেরকম মেজাজ থাকে, তা এই মৃত স্ত্রীলোকটির দৈর্ঘ্য। এ রকম দীর্ঘ দেহ নেপালিদের হয় না। অভিনবত্ব তা আকৃতির এমন কি পোশাকেরও অনেক ধীরস্থির মানুষের মতিভ্রম ঘটায়—তা তুমি এ গল্পেই দেখতে পাবে।

কিন্তু তার মৃত্যুটা মিথ্যা নয়, বিভৎসও বটে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের গোড়া থেকে তলপেট পর্যন্ত যেন দুফালা ক'রে কেটে ফেলা হয়েছে।

নাকে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে এসে যখন সে হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছে, হাসপাতালের হাতায় স্কুটারের শব্দ শোনা গেলো। তারপর কুজুরকে দেখা গেলো।

—কি খবর, কুজুর?

—খুনী আসছে?

—খুনী? সে কি?

মোষের গাড়িতে খুনীকে রওনা ক'রে দেয়ার কথা বললো কুজুর। গজেন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে বললো,—খুনী বলছো, অথচ মোষের গাড়িতে তাকে রেখে চ'লে এসেছো? কি মুস্কিল!

কুজুর বললো,—তার এখন আর পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া গাড়ির ধুরোর সঙ্গে তাকে এমন ক'রে বেঁধেছে গাড়োয়ান যে উঠে বসার ক্ষমতাও তার নেই।

গজেন্দ্র বললো,—খুনী যদি না পালায় তা হ'লে তোমাকে লাকি বলবো। আর পালালে কি হবে বুঝতেই পারছো। আবিশ্যি, তোমার লাক।

মোষের গাড়িতে আসতে এত রক্তক্ষরণ হয়েছিলো যে খুনীকে বাঁচানোর আশাই ছেড়ে দিলো ডাক্তার। কিন্তু কি অদ্ভুত জীবনীশক্তি। কয়েকটা সেলাই দিয়ে য্যাণ্ডেজ বাঁধার পর গোটা দুতিন ইনজেকশন দিতেই লোকটির নাড়ি যেন স্বাভাবিক হ'লে এলো।

বিকেলের দিকে হাসপাতালে যাদের পাহারায় রাখা হয়েছিলো তাদের একজন কনস্টেবল থানায় এলো রাস্তার যোগাড় করতে। তার মুখে শোনা গেলো ডাক্তার বলেছে, কাল নাগাদ জবানবন্দী নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

[গজেন্দ্র পুতুণ্ড বেশ মনোযোগ দিয়ে তার গল্প ব'লে যাচ্ছিলো। বললাম,

—কিন্তু এর মধ্যে, গজেন্দ্র, তোমার কুকুর নেই কিন্তু।

গজেন্দ্র হাসলো। বললো, নেই মানে। তুমি কি আমাকে সাহিত্যিক পেয়েছো যে কুজুরকে লাকি ডগ্ ব'লে কুকুরের কাজ সেরে নেব?]

পরদিন সকালে থানায় ব'সে গজেন্দ্র কুজুরের রিপোর্ট পড়ছে। ডাক্তার বলেছে, আর একটু সুস্থ হ'লেই জবানবন্দী নেয়া যেতে পারে, কারণ জখমী খুনীর ক্রাইসিস কেটে যাচ্ছে। বেশ ভালো লাগছিলো গজেন্দ্রর। সকালের রোদটা বেশ খট্‌খটে রকমের নাতিশীতোষ্ণ।

তা ছাড়া প্রাতরাশটা আজ বেশ ভালো হয়েছে। সকালেই ডিমের ডেভিল সহযোগে লুচি পুরুষের মনকে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকলকে ভাই ব'লে ডাকবার উপযুক্ত ক'রে দেয়। পরদায় হাওয়া লেগে দুলছে। তাতে থানার পিছন দিকে কোআর্টার্সগুলিও চোখে পড়ছে। আরে! তাইতো! এটাতো এতদিনেও নজরে পড়েনি। ও কোয়ার্টারটাই বোধ হয় কুজুরের। একটা খাড়া করা বাঁশে দড়ির ফাঁস পরিয়ে সে দড়িটাকে অন্য একটা খাড়া করা বাঁশের মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দড়ির মাথাটা মাটিতে একটা খোঁটায় বেঁধে দিলো একটি মহিলা। ওই বোধ হয় কুজুরের মেমবউ। কাঁধ থেকে অনাবৃত বাহু দুটি চক্‌চকে রোদে লালচে দেখাচ্ছে। একবার যেন মুখটার একপাশও। বাদামি রংএর চুলগুলি ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। কুজুর হয়তো ঘুমাচ্ছে। কুজুরের ভাগ্যকে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। গাউনের নিচে সুন্দর পা দুখানা। গজেন্দ্রর মনে হ'লো অনেকদিন সে বউকে আদর করেনি। এখন গিয়ে একটু করলে হয়।

কিন্তু রিপোর্টে ব্যাপারটা কুজুর এমন ক'রে সাজিয়েছে যে ভাগ্যের চাইতে দক্ষতাই প্রাধান্য পেয়েছে। হ্যাঁ তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দক্ষতা। এটা একটা দুর্বলতাই বোধ হয় মানুষের যে সৌভাগ্যকে পেলে সে তাকে অস্বীকার ক'রে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতিকেই প্রশংসা করে। আর এ জনোই বোধ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

রিপোর্ট পড়তে পড়তে গজেন্দ্র আর একটা কিছুকেও আশা করছিলো। খুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রেডিওতে সদরকে জানিয়েছে। তার একটা উত্তর সে আশা করছিলো। হয়তো খবর আসবে সার্কেল ইনস্‌পেক্টর বা দুনম্বর ডি.এস.পি আসবেন। পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র গোঁ গোঁ ক'রে উঠছে। কথা চলছে। এ.এস.আই সুধীর মুখোটি ঢুকলো গজেন্দ্রর ঘরে হন্তদন্ত হয়ে। খবর, স্যার। এক নম্বর ডি.এস.পি আসছেন, এস.ডি.পি.ও আসছেন, সার্কেল ইনসপেক্টর আসছেন, আর মিস্‌ ক্যাথলীন।

গজেন্দ্রর রক্তপ্রবাহে সকালের রোদ যে অলস আমেজের বুদ্‌বুদ্‌ রচনা করেছিলো এক মুহূর্তের বন্যায় যেন তা সব ভেঙে গেলো, ভেসে গেলো। সময়ের দিক দিয়ে বারো ঘণ্টাও নেই আর। বারো ঘণ্টায় একটা ওলোটপালোট হ'য়ে যাবে। উঠে হাঁক দিলো গজেন্দ্র। সাজো সাজো রব প'ড়ে গেলো সেই হাঁক থেকেই। থানার টেবল চেয়ার, দেয়াল মেঝে, লন, রাস্তা, বুট, বোতাম, বেল্টের চামড়া মেজে ঘষে, ঝেড়ে পুঁছে, ধুয়ে পাখলে সব কিছু ঝক্‌-ঝকে ক'রে ফেলতে হবে। গজেন্দ্র হুকুম দিলে। বেলা চারটেতে কনস্টেবল এবং এস.আই-দের পুরো পোশাকে ফল্‌ ইন করতে হবে। কিন্তু এই তার শেষ কাজ নয়, সবে সুরু। সে কুজুরের স্কুটারে ক'রে ফরেস্ট অফিসে গেলো। তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার, এখনই দরকার। কারণ এ অঞ্চলে একটিমাত্র ডাকবাংলোই আছে—আর সে ডাকবাংলো ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের।

এদিকে সময়টা সাঁ সাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে। বেলা চারটের ফল্‌ ইন পর্বে খুশী হ'লো গজেন্দ্র। তা সত্ত্বেও মনে হ'লো তার আর একবার ডাকবাংলোটা ঘুরে দেখে আসা উচিত। চারখানা কামরা পাওয়া গেছে। নেয়ারের খাট পাতা, নেটের মশারি। ঝক্‌ঝকে টেবল চেয়ার। টেবিলে ফুলদানিতে ফুল। একেবারে উত্তরের ঘরে থাকবেন ডি.এস.পি তার পাশের ঘরে এস.ডি.পি.ও, তার পরেরটিতে মিস্‌ ক্যাথলীন, এবং সবশেষের ঘরে ইনস্‌পেক্টর। রসুই ঘরে একটা পাঁঠা, এক ঝাঁকা মুরগী, ঝুড়িভরা ডিম, বালতিভরা দুধ। খুশী হ'লো গজেন্দ্র। কিন্তু পায়ে পায়ে সে ফিরে এলো মিস্‌ ক্যাথলীনের জন্য যে ঘরখানা রাখা হয়েছে সেখানাতেই। সে অনুভব করলো জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থাকা

সত্ত্বেও সে জানে না মিস্‌ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘর কি ক'রে গোছাতে হয়। টেবিলটা চেয়ারটা সে অকারণে টানলো। বিছানার ধবধবে চাদরটা একবার টেনে আর একটু ঠিক ক'রে দিলো। ঘরে ঢুকবার দরজায় ভালো একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দার ঠিক নিচেই প্রকাণ্ড পাপোষ। এমন পাপোষ এর আগে দেখেনি সে। এত বড়, এমন সুন্দর। আর সে জানেও না মিস্‌ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘরে পাপোষটা ঠিক কোথায় থাকে —পর্দার ভিতরদিকে, না বাইরে, না খাটের পাশে।

ঘণ্টা চারেক বাকি আর। গজেন্দ্র থানায় ফিরে গেলো। কি করবে তা সে খুঁজেও পাচ্ছে না। কিন্তু কিছু না করেই বা এমন উদ্বেগ নিয়ে মানুষ কি ক'রে থাকবে? অগত্যা গজেন্দ্র নাপিত ডাকিয়ে আনলো। নিজের কোয়াটারের বারান্দায় ব'সে নাপিতকে দিয়ে চুলে আর একবার কাঁচি বুলিয়ে নিলো। হ্যাঁ, এবার যেন আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমন সুন্দর ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে অথচ গজেন্দ্রকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না? এমন সৌভাগ্য! পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র আবার বেজে উঠলো। খবর দেয়া নেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখোটি এসে খবর দিলো, যে ব্যবস্থাই হ'ক, মিস্‌ ক্যাথলীনের পাশের ঘরেই তার অভিভাবককে থাকতে দিতে হবে।

—সে কি? তা হ'লে ইনস্‌পেক্টরবাবু থাকবেন কোথায়? মুখোটির পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।—কেন, ক্যাথলীন আর তার অভিভাবক কি এক ঘরে থাকতে পারে না? গজেন্দ্র প্রায় আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

মুখোটি বললো,—তা হয় না ওরা বলছেন। তাতে নাকি ক্যাথলীনের ঘুম হয় না।

—এখন? এই মুহূর্তে আর একখানা ঘর কি আমি ডাকবাংলোয় গড়াবো। গজেন্দ্র খেঁকিয়ে উঠলো। এসে তো শুনবেন খুনী ধরা পড়েছে। তার জন্যে—

কিন্তু রাগারাগিতে সমস্যাটা দূর হচ্ছে না। এ.এস.আই দত্তগুপ্ত বরং সাহায্যে এগোলো।—আমাদের এদিকে রাখলে হয় না, স্যার।

—কোথায়? থানার টেবিল জোরা দিয়ে শোয়াবে? মলো যা।

—তা নয়, স্যার, আপনার কিম্বা কুজুর সাহেবের বাসায়।

—তালেই হয়েছে। আমার বাসা। আস্ত একটা মশারি দিতে পারবো কিনা সন্দেহ। আর দেয়ালে রং পড়ে না কতদিন, তা জানো।

—কিন্তু কুজুর সাহেবের বাসাটা বেশ সাজানো গোছানো। মেমবউ এ বিষয়ে—

গজেন্দ্র ভাবলো। এই সময়ে কুজুর এসে দাঁড়ালো। বয়স তার কম। ছিপছিপে স্মার্ট চেহারা। কড়া ইস্তি করা থাকিতে যেমন তাকে দেখাচ্ছে তেমন আর কোনদিনই দেখায়নি।

—গজেন্দ্র বললো,—আচ্ছা, কুজুর—

—বলেন কিছু?

—একটা সমস্যায় পড়া গেছে। ইনস্‌পেক্টর বাবুকে কোথায় রাখি? তোমার বাসাতে কি ব্যবস্থা হয়?

—আমার বাসায়, ইনস্‌পেক্টর? কুজুর ভাবলো। আপনার বাসায়?

—বড্ড ময়লা, বড্ড ময়লা। আমি থাকি বলেই কি ইনস্‌পেক্টর থাকতে পারে? তোমার বাসায়।

কুজুর বললো,—আচ্ছা, তা হ'লে।

গজেন্দ্র আবার হাঁক দিলো। কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে কুজুর গেলো তার বাসায়, অতিথির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে।

কুজুর যখন ওদিককার ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এলো গজেন্দ্র কিন্তু ততক্ষণে আর একটি সমস্যা ভেবে রেখেছে।

—আচ্ছা, কুজুর।

—বলুন।

—আমাদের দুজনেরই এখন থানায় ব'সে থাকা ভালো দেখাবে? মানে যেন আমাদের হাতে কোন কাজই নেই।

—কাজের অভাব কি?

—সেটাইতো দেখাতে হয়। কোন একটা তদন্ত নিয়ে তুমি কিম্বা আমি বেরিয়ে যাই। ওরা আসার কিছু পরে ফিরলেই হ'লো।

কুজুর কিছু ভাবলো, তার পরে বললো,—তা হ'লে আমিই যাই। হবে না কিছু তবু তিনঝোরা বাগানের চুরির তদন্তটা সেরে আসি।

—তাই যাও না হয়।

কুজুর স্কুটারের শব্দ তুলে চ'লে গেলো।

এটা গজেন্দ্রর মনের একটা জটিল প্রক্রিয়া। কুজুরের মতো স্মার্ট এবং দুর্লভ-সৌভাগ্যবানকে কে নিজের পাশে রাখে কোন পরম মুহূর্তে? সে থাকলে কি তারই উপরে প্রথম দৃষ্টিটা পড়বে না? কিন্তু প্রথম দৃষ্টির চাইতে এমন মূল্যবান আর কি? কাজেই কুজুরকে সরিয়ে দেয়া।

[গজেন্দ্র নিজের মনের প্রক্রিয়াটাকেও গোপন রাখলো না, কিন্তু তার গল্পটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে? কুকুর দিয়ে সুরু হয়েছিলো, খুন এসে পড়লো, তারপরে এলো মেমবউ, এখন তাকে পাশ কাটিয়ে ক্যাথলীন! এর পরে কি ক্যাথলীনকেই সে খুনের কারণ হিসাবে দাঁড় করাবে? ক্যাথলীন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান একটি মহিলা হলেও পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে খুনের তদন্তে সে ঘুরে বেড়ায়, এটা যে শিশুর কল্পনার পক্ষেও বাড়াবাড়ি তা কি গজেন্দ্র বোঝে না?]

জিপ এসে থামলো। আর জিপের ঠিক আগে আগে অজয়ের স্কুটার। ঠিক যেন ভি.আই.পি-দের মোটরের আগে স্কাউটদের মোটর বাইক।

তখন ঠিক রাত আটটা। থানার ডেলাইটগুলো জ্বলে দিনের আলো ক'রে ফেলেছে। থানার কনস্টেবলরা গার্ড অব অনার দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলো। জিপ থামতেই আর্মস প্রেজেণ্ট করলো তারা। ঝক্ ঝক্ করছে তাদের সদ্য ইস্ত্রি করা উর্দি, বোতাম, বেল্ট, বুট থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

জিপ থেকে নামলেন ডি.এস.পি, তারপর ক্যাথলীন আর তার এক সঙ্গী, তারপর অর্ডারলিরা। অন্য জিপ থেকে এস.ডি.পি.ও এবং ইন্সপেক্টর। আর তারপর জিপকে পথ দেখিয়ে আনবার জন্য খেয়াঘাটে যে কনস্টেবলটিকে পাঠানো হয়েছিল সে আর তার সঙ্গে একজন ভদ্র চেহারার ব্যক্তি।

অভ্যাগতরা যখন থানার ঘরে ঢুকছে, দুএক পা পিছনে গজেন্দ্র কুজুরের পাশে পাশে চলার সুযোগ ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—লোভ সামলাতে পারলে না বুঝি?

—কিসের লোভ?

—কি বলি, মিস্ ক্যাথলীনকে দেখবার?

কথাটা নিচু গলায় রসিকতার মতো বলা হ'লেও যথেষ্ট ঝাঁজালো।

কুজুরের মুখে ধরা পড়লো ঝাঁজের ধাক্কা। কিন্তু সে বললো,—চোর ধ'রে আনলাম যে। তিনঝোরা বাগানের নয়। অনেকদিন আগেকার বাকডোরা বাগানের চায়ের দোকানের ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছিলো।

সাধে কি লাকি ডগ্ বলে তাকে! অভ্যাগতদের সামনেই হাজতের দরজা খুলে কুজুর ভদ্রচেহারার সেই ব্যক্তিটিকে তার মধ্যে পুরে দিলো। চোর হ'লেই যথেষ্ট ছিলো। এ তার চাইতেও বেশি। এবস্কণ্ডার। এটা কি ডি.এস.পি-রা নোট করবেন না।

কিন্তু তখন কি এদিকে লক্ষ্য করার সময় ছিলো। ডি.এস.পি বসেছেন, এস.ডি.পি.ও বসলেন। ক্যাথলীন? সেই লঘুদেহা তন্বঙ্গী বিদেশিনী? গজেন্দ্রর অনেকদিন মনে থাকবে এই প্রথম মিনিট কয়েকটিকে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাথলীন। এদিক ওদিক যাচ্ছে, এটা দেখছে, ওটা পরখ করছে। এই চঞ্চলতা, যাকে অন্য কেউ কেউ চটুলতা ব'লে থাকে, ক্যাথলীনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কি করবে গজেন্দ্র? কুজুর অবশ্য পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। গজেন্দ্র এই সময়ে তার উপস্থিতি চায় না এটা বুঝতে পেরেই। গজেন্দ্র ভাবলো, সে কি ক্যাথলীনকে কিছু বলবে? নাকি তার পক্ষে তা বলা অসমীচীন হবে? আর কথা যদি বলতেই হয় তবে তা কি ইংরেজি কিম্বা বাংলায় হবে?

কিন্তু অতিথিই অনেক সময়ে আমাদের দুশ্চিন্তার লাঘব ক'রে দেয়। মিস্ ক্যাথলীন আসন গ্রহণ করলেন। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ যেন এই নতুন পরিবেশও তার কাছে পুরনো মনে হ'লো। এটাও ক্যাথলীনের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কিছুটা সিনিক সে। এ রকম জীবনের ফলই তাই। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে যে ঔদাস্য আসতে পারে তেমন কিছুই যেন। উত্তেজক কিছু ছাড়া এখন কিছুই তাকে উৎসুক করতে পারে না।

হাজতের সামনেই সে ব'সে পড়লো। আর তখন তার ছোট্ট সুন্দর জিভটার অগ্রভাগ খানিকটা প্রকাশিত হ'লো। নীলাভ চোখ দুটিতে যেন অলস বিরক্তির ছায়া। গলার রুপোলি কলারটায় আলো প'ড়ে চক্ চক্ করলো। কান দুটো একটু নড়লো।

[বললাম,—বা, গজেন্দ্র, বা। ক্যাথলীন তা হ'লে?

—হ্যাঁ, সে আমাদের মেয়ে কুকুর যে শুঁকে শুঁকে খুনী ধরে।

সিগারেট ধরিয়ে গজেন্দ্র আবার সুরু করলো।]

অনেকটা পথ জিপে এসেছেন কাজেই ওঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া গজেন্দ্রর ব্যবস্থা অনুসারে ডিনারও নটায় তৈরি। যেটুকু থাকবার থেকে ডি.এস.পি-রা বিদায় নিলেন ডাকবাংলোয় যাওয়ার জন্যে। লেখাপড়ার কাজ যা দরকার কাল সকালে হবে, আর আসল কাজও। গজেন্দ্র এবং কুজুর ডাকবাংলোয় গিয়েছিলো। তারা কিছু কিছু খুঁটিনাটিও জেনে এসেছে। ক্যাথলীন যখন তার কাজ করবে তখন কি বাইরের লোককে সরিয়ে দিতে হবে? এটা একটা সমস্যাই। যেখানে খুন হয়েছে সেই অনেক দূরের চা বাগান থেকে পথ শুঁকে শুঁকে এগোবে ক্যাথলীন তখন তো একটি পথই, একটি নির্দিষ্ট পথেই সে চলবে না। তার গতি হবে ভাগ্যের মতো অনির্ধারিত। সেই অনির্দিষ্ট পথে কি ক'রে পাহারা বসানো যাবে। ডি.এস.পি বলেছেন ক্যাথলীন কি ক'রে অপরাধী খুঁজে বার করে

এ লোকে যত দেখে ততই ভালো। কাল দুপুর নাগাদ যদি ক্যাথলীন এই প্রথম কাজটা শেষ করতে পারে, কিছু কিছু খেলাও দেখাবে আর তখন তো ট্যারা পিটিয়ে না হ'ক, মুখে মুখেও লোক ডাকতে হবে খেলা দেখার জন্যে।

গজেন্দ্র এবং কুজুর যখন থানায় ফিরলো রাত এগারোটা বাজে। গজেন্দ্রকে তখন খুব উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। তা থেকে বোঝা যায় অফিসারদের সঙ্গে আলাপটা বেশ ভালোই হয়েছে। তার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

থানায় তখন ডেলাইটগুলো জ্বলছে। কিন্তু গজেন্দ্র একটু অবাক হ'লো সব কটি কনস্টেবল, সব কটি এ.এস.আই তখনও কাজ করছে যেন। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে দোষ দেয়া যায় না। তাদেরও কি উত্তেজনার কারণ নেই?

গজেন্দ্র হাসিমুখে বললো,—আজ কি সকলেরই ডিউটি নাকি?

ওরা লজ্জিত হ'লো।

এ.এস.আই মুখোটি বললো,—এই যাই, স্যার, আপনি ফিরলেই যাবো ভাবছিলাম।

এ.এস.আই গোবিন্দ বাড়ুয্যে বললো,—আসল কথাটা বললেই হয়, বাপু, খুনী ধরার ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাও।

এ.এস.আই সুভগ সিং বললো,—অন্যাই কি? আচ্ছা স্যার, আমরা তো দেখতে পাবো?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মুখোটি বললো,—দেখো, বলেছিলাম।

বোঝা যায় সাহেবরা যখন ডাকবাংলোয় ডিনার নিয়ে ব্যস্ত এবং গজেন্দ্র এবং কুজুর তার তদারকে, এরা তখন থানার ঘরে গভীর একটা আলোচনা করেছে। সেটা স্বাভাবিকও। খুনের জায়গায় কিইবা আছে। লাস কাটা ঘরে লাস প'ড়ে আছে। আর কোন ঘরে খুন হয়েছিলো তা জানা আছে। এ থেকেই কে খুন করেছিলো তাকে খুঁজে বার করে দেবে ক্যাথলীন। আর তা দেবে সব বুদ্ধির অগম্য উপায়ে।

মুখোটি বললো,—আচ্ছা, স্যার, ওর গলার যে কলার সেটা কি প্লাটিনামের?

বাঁড়ুয্যে বললো,—এ তোমার বাড়াবাড়ি। রূপো কি এমন কম হ'লো।

গজেন্দ্র এদের চাইতে বেশি জানার ভান করলো কিন্তু কি উত্তর দেবে খুঁজে পেলো না। পদমর্যাদা অনুসারে দুজনকেই নিরস্ত ক'রে বলতে হয়—প্লাটিনামও নয়, রূপোও নয়।

সুভগ সিং বললো,—ওর বাবা নাকি ইংরেজ?

—তাইতো শুনলাম।

—আর মা ফরাসী?

—তাই হবে।

—আচ্ছা? সুভগ সিং চেখে চেখে সংবাদটাকে অনুভব করলো।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—আচ্ছা, স্যার, ওকি সাহেবদের সঙ্গে একই টেবলে খেলো? মুখোটি বললো, বাঁড়ুয্যের যে কথা, ওকি অফিসার?

—তা তুমি অস্বীকার করবে কি করে? সাড়ে চারশ' মাইনা পায় জানো?

—তাই পায় নাকি, স্যার?

—তাই তো শুনলাম। গজেন্দ্র বললো।

বেশ লাগছে পরিস্থিতিটা। তার থানায় এমন একটা ব্যাপার ঘটবে তা সে ইতিপূর্বে আশা করেনি। যতক্ষণ ওরা থাকবে ততক্ষণ তো বটে, তার পরেও বেশ কিছুদিন তার থানা সম্বন্ধে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে, আর থানার কর্তা হিসাবে তার সম্বন্ধেও। একটা সিগারেট ধরালো গজেন্দ্র আয়েস করে। আর তার বসা দেখে তার অধস্তন এ.এস.আই এবং কনস্টেবলরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এ.এস.আই মুখোটি বললো,—খুনীতো আমাদের কুজুর সাহেবই ধরেছেন। তবে কাকে ধরবে তাই ভাবছি।

গজেন্দ্র বললো,—সেই যদি খুনী হয় তবে তাকেই ধরবে।

—বারো তেরো মাইল গন্ধ শুঁকে এসে হাসপাতালে!

—তোমার কি মনে হয়?

—তাই সম্ভব।

একজন কনস্টেবল বললো, সাড়ে চারশ' মাইনা? ইনস্‌পেক্টরের চেয়ে বেশি?

—কাজটাও দেখো।

—তাহলে পেন্সানও পাবে?

গজেন্দ্র নিজে এ বিষয়ে ঠিক কিছু জানে না। কাজেই ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে ক'রে দেয়ার জন্য সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার কি মনে হয়?

—তাই হবে, স্যার।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—টেবলে খাবার রেখে চেয়ারে ব'সে খেয়ে ও সত্যি আরাম পায় কিনা তাই ভাবছি।

—কেন পাবে না? সুভগ সিং বললো। তার দেবদ্বিজে পরলোকে গভীর ভক্তি। ওকি যা তা ব্যাপার ভাবেন। আগের জন্মে খুব বড় জ্ঞানী কেউ ছিলো।

একজন কনস্টেবল বললো, চারশ' টাকা? কি করে টাকা দিয়ে। ছেলে মেয়ে তো নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার।

মুখোটি বললো,—আমি ঠিক ধরতে পারছি না একটা ব্যাপার। মনে করুন যদি ও হাসপাতালের আসামীকে না ধরে তবে কি আমরা বুঝবো কুজুর সাহেব যাকে ধরেছেন সে আসামী নয়?

আলোচনায় বাধা পড়লো ইনস্‌পেক্টর আসাতে। ডিনার শেষে গল্পগুজব শেষ করে শুতে এসেছে সে। তাকে দেখে আর একবার স্যালুট করলো সবাই। তারপর সে কুজুরের সঙ্গে তার বাসার দিকে চ'লে গেলো। আর তখন কনস্টেবলরা আর এক দফা আলোচনা করলো।

—কুজুর সাহেব কিন্তু খুব মনমরা হ'য়ে আছে।

—বোধ হয় ভাবছে যদি ঠিক আসামী না ধ'রে থাকে।

—কিন্তু একটা মজার ব্যাপার দেখো। চারশ' টাকা যদি মাইনা পায় তাহলে তো ও ইনস্‌পেক্টরই হ'লো। সেলুট করতে হবে নাকি?

পরদিন সকালে যা হ'লো তাকে তুলনা দিতে হ'লে বিলেতি ফকস্‌হাণ্টের কথা বলতে হবে। বললো গজেন্দ্র। এখন সে দেশে সে খেলা আছে কিনা জানি না, তোমরা সাহিত্যিকরা বলতে পারো। ঘোড়ায় চ'ড়ে বিশেষ ভদ্রলোকরা (খানদানি ভদ্রলোক ছাড়া কার বা তেমন

পোশাক বা ঘোড়া থাকে, কাদের মহিলারাই বা অমন সাদা গ্লাবস পরে) শিয়ালকে তাড়া করেন। খানাখন্দ মাঠ বেড়া টপকিয়ে ডিঙিয়ে উঠে প'ড়ে ছুটে সেই খেলা চ'লে। একটা শিয়ালের পিছনে পঁচিশজন ভদ্রলোক। গজেন্দ্রদের ব্যাপারটাও তেমনি হলো। একটা কুকুর ছুটে চলেছে আর তার পিছনে তারা ছুটছে, কেউ জিপে, কেউ স্কুটারে, কারো পনি, বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে। বনবাদাড় ডিঙিয়ে টপ্‌কে কুকুর চলছে তো তারা চলছে, সে থামছে তো তারাও থামছে। শোঁক শোঁক ক'রে মাটি শুঁকছে, কান লট্‌পট্‌ করছে, জিভ লক্‌লক করছে। একটা চাপা উত্তেজনায় যেন সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আর তার সে উত্তেজনা তাদের দেহমনেও সঞ্চারিত। যে ঘরে খুন হয়েছিলো সেখান থেকে বেরিয়ে রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে কয়েক পাক এলোমেলো ঘুরে ক্যাথলীন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধ'রে ছুটে চললো। তার সঙ্গে গজেন্দ্ররাও। শুধু পুলিশের লোকরা নয়। ফরেস্টের লোকেরা। কাছাকাছি চা বাগানের দুচারজনও। ছুট্‌ছুট্‌। সুভগ সিংএর পা মচকে গেলো এক খানায় পড়ে, বনের মধ্যে গাছের ডালে মাথা ঠুকে গেলো ইনস্‌পেক্টরের—বাপ্‌ ব'লে সে ব'সে পড়লো কিন্তু ছোটা বন্ধ হ'লো না। সকাল থেকে সুরু হয়েছিলো দুপুর দুটোয় ক্যাথলীন তুংসুংএ হরকামায়ার বাড়িতে পৌঁছে এঘর ওঘর ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতে লাগলো। ডি.সি.পি হাসিমুখে বললো সমবেত সকলকে, দেখলেন'ত! বারো মাইল পথ কি করে এসে পৌঁছালো।

হাসিমুখে সিগারেট ধরালেন তিনি। রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতেও ভুলে গেলেন।

প্রস্তাবটা দিতে হ'লো গজেন্দ্রকেই।

সাহসভরে এগিয়ে গিয়ে সে এস.ডি.পি.ও-কে বললো। তিনি ডি.এস.পি-কে বললেন। আয়োজনটা গজেন্দ্ররই। এস.ডি.পি.ও-র নিজের আসনের নিচ থেকে বেরুলো স্যাণ্ডউইচ-এর চ্যাঙারী এবং কফির ফ্ল্যাস্ক। ডি.এস.পি; এস.ডি.পি.ও চা বাগানের সাহেবরা তার সদ্ব্যবহারে লাগলেন। কিন্তু গজেন্দ্র প্রত্যক্ষদর্শী। তার আয়োজনে খুঁত থাকে না কুজুরের স্কুটারের পিছনের বাধা কম্বলের পুটলি খুলতে বেরুলো চা, চিনি, এক কৌটো দুধ। চায়ের কাপ গ্লাস।

এই বিশ্রামের পরেই আবার যাত্রা। কিন্তু ঠিক আগের মতো নয়। ডি.এস.পি কফি পানের পর বললেন,—এখন ক্যাথলীন বিশ্রাম করতে পারে। আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা দয়া করে সন্ধ্যায় হসপিট্যালে যাবেন। সেখানে আপনারা অন্য একটি দৃশ্য দেখতে পাবেন।

এর পরে এক জিপে উঠলেন ডি.এস.পি, এবং পদস্থ যাঁরা। ক্যাথলীন অবশ্যই। সে এস.ডি.পি.ওর পাশের সিটেই উঠে বসেছে।

গজেন্দ্র কুজুরের পিছনে উঠে বসলো। সুভগ সিং প্রভৃতি চললো সাইকেলে। অন্যেরা হেঁটে।

ডি.এস.পি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হ'লো। আশ্চর্য আর কাকে বলে? চোখে না-দেখলে প্রত্যয় হয় না। হসপিট্যালে লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে কি ক'রে খবর পেলো ভাবতে অবাক লাগে। এটা বোধ হয় মানুষের একটা মৌলগুণ, সে সত্যকারের ভালো কিছু স্বার্থপরের মতো আত্মসাৎ করে না। প্রত্যেক মানুষই অন্য অনেক মানুষকে খবর দিয়েছে ক্যাথলীনের। তখন আকাশে ক'নে দেখা আলো; ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া

হ'লো হস্‌পিট্যালের কাছে একটা জামগাছতলায়। কিছুক্ষণ যে সেন উন্মাদের মতো আকাশ শুঁকলো কিন্তু তা এক মুহূর্তই। তারপর সে হস্‌পিটালের হাতায় ঢুকে পড়লো। একটু বিমর্ষতা, একটু যেন স্তব্ধতা, তারপর দৌড়ে ছুটে গেলো। শিকল ধ'রে তার সঙ্গীও তার সঙ্গে। একেবারে লাশকাটা ঘরের বন্ধ দরজার উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারপর আবার একটু স্থিধা। এর পরে সে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো হস্‌পিট্যালের ঘয়ে। এঘরে ওঘরে কাউকে যেন খুঁজে ফিরছে। হস্‌পিটালের দুতিনটে সিট খালি ছিলো সেখানে কনস্টেবলরা রোগী সেজে শুয়েছে। সেদিকে দৃক্‌পাতও করলো না। এ দরজা দিয়ে ও দরজা দিয়ে, হস্‌পিট্যালের দরজাগুলো নতুন আগন্তুকের কাছে গোলক ধাঁধা বিশেষ, বেরিয়ে ঢুকে অবশেষে সে সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো যেখানে আসামী। এক মুহূর্ত স্থিধা তারপরই নিচু একটা ক্রোধের শব্দ ক'রে সে শয্যাশায়ী আসামীর হাত কামড়ে ধরলো। ভাগ্যে আসামীর হাতে আগে থেকেই হলদে মোটা কাপড়ের একটা পটি বাঁধা ছিলো।

দর্শকদের থামাতে বেগ পেতে হয়েছিলো। হস্‌পিট্যালে গোলমাল করা বারণ একথা ব'লে হাঁকডাক গোলমাল ক'রে বেড়াতে হলো গজেন্দ্রকে।

থানার দিকে ফিরে চললো দলটি। ফুটবল বিজয়ী ক্লান্ত কিন্তু আনন্দউজ্জ্বল একটি দল যেন।

বাকি খেলা কাল হবে। আংটি খুজে দেবে ক্যাথলীন, রুমাল চোরকে পাকড়াও করবে। দলের মুখে এই কথাই। কি আশ্চর্য! একি কেউ ভেবেছে। তাজ্জব! কেয়াবাৎ অদ্ভুত।

সকলেই গল্প করছে। একজন কনস্টেবল বললো,—কুজুর সাহেব তা'লে ঠিক আসামীই পাকড়েছেন।

—বেশক্‌।

—দেখো, কুজুর সাহেবও কম যায় না! ধরেছিলো তো।

—ভাগ্যবান লোক যে।

—কিন্তু ভাগ্য তো প্রতিবারেই সাহায্য করবে না।

—তা ঠিকই বলেছ। এর বেলায় ভাগ্য টাগ্য কিছু নয়? কুজুর প্রশ্ন করলো।

—আচ্ছা গলার কলারে কিছু লেখা দেখলে না? একজন কনস্টেবল চাপা গলায় বললো।

—আমারতো মনে হ'লো ইনস্‌পেক্টর কথাটাই লেখা আছে।

—তাহলেই বা দোষ কি? কোন ইনস্‌পেক্টর এমন পারে বলো।

থানার ঘরে ওরা সবাই বসলো। ডি.এস.পি, এস.ডি.পি.ও, ইনস্‌পেক্টর। ক্যাথলীনের আজ আর স্থিধা নেই। সেও একটা চেয়ারের উপরে লাফ দিয়ে উঠে বসলো। ডি.এস.পি হেসে সিগারেট ধরালো।

মানুষের মনের অবস্থা সামান্য একটা কথাতেই প্রকাশ পেতে পারে। এস.ডি.পি-ও একটা পরিতোষের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন,—আহা, গজেন্দ্র, একটু চা হয়?

[বললাম,—গজেন্দ্র, চা তোমরা খাও, কিন্তু তোমাদের কারো মনেই প্রশ্ন ছিলো না?

—কেন থাকবে। যদি তুমি একটা গল্প লেখার মেশিন পাও তুমি কি প্রশ্ন করবে, না কলের হাতল ঘুরাবে? তদন্ত, তদন্ত, তদন্ত, সারা জীবনই আমাদের

তদন্ত আর তার মধ্যে বেশির ভাগই ব্যর্থ। এই একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

বললাম,—বলো।]

হাঁকডাক করে মুহূর্তে চায়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেললো গজেন্দ্র। চা খেতে খেতে ডি.এস.পি. বললেন, আমরা তো চা খাচ্ছি, কিন্তু ক্যাথলীন।

—ওকি চাও খায় নাকি?

এস.ডি.পি-ও সোৎসাহে বললেন,—মদ খেলেও মানায়। কিন্তু ক্যাথলীনের মদ কিম্বা চা কোনটার দরকার ছিলো না। সে হঠাৎ টপ্ ক'রে চেয়ার থেকে নামলো। তারপর দরজার দিকে চললো।

তার সঙ্গী বললো,—বোধ হয় বিশ্রাম করতে চায়।

ডি.এস.পি বললো,—আন্‌প্রেডিক্টেবল্

এস.ডি.পি.ও বললে,—কিছুটা হয়তো দাম্ভিকাও

ইনস্‌পেক্টর বললো,—আশ্চর্য কি!

ক্যাথলীন সত্যি সত্যি চ'লে গেলো। অনুমান সে যখন বারান্দা পার হচ্ছে তখন হঠাৎ পাহারারত কনস্টেবল চিৎকার ক'রে উঠলো—আইজ রাইট—অ্যাজ ইউ আর। খট্ খট্ করে জুতোয় জুতো লাগানোর শব্দ হ'লো, রাইফেল নামানো ওঠানোর শব্দ হ'লো।

এস.ডি.পি.ও বললেন,—কি হ'লো?

—স্যালুট করলো পাহারাদার?

—তা ঠিকই করেছে। ডি.এস.পি বললেন,—চা খেয়ে ওঁরা গেলেন।

গজেন্দ্র বললো,—কুজুর, এক হাত তাস খেললে কেমন হয়?

—তাস?

—ভালো লাগছে না? বেশ দিনটা আজকে।

—তাস? একটু চা খাই বরং।

—খাও, খাও। ওরে দেখ না কেটলিতে আর চা আছে নাকি?

একজন কনস্টেবল প্রশস্ত কেটলিটা নিঙড়ে কয়েক কাপ চা পেলো। এগিয়ে দিলো গজেন্দ্র ও কুজুরের সামনে। এ.এস.আই রাও হাত বাড়িয়ে নিলো চা। গজেন্দ্র আর একবার তার থানার জন্যে গর্ব অনুভব করলো। ইতস্তত চেয়ে দেখলো সে। কুজুর মন দিয়ে চা খাচ্ছে। চায়ের কাপেই তার মন। এ.এস.আই-রা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। তার কিছু দূরে কনস্টেবলরা।

—তোমরা কি আজও রাত জাগবে নাকি? হাসি মুখে বললো গজেন্দ্র।

—না, না এই যাই।

—তা হ'লোই বা, স্যার, একটু রাত। একদিনই তো।

—কুজুর, তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে? ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। অভিভাবক-সুলভ গলায় বললো গজেন্দ্র।

কুজুর নিশব্দে চা খেতে লাগলো।

সুভগ সিং বললো,—আচ্ছা, স্যার, পাহারাদার সেলুট ক'রে ভালোই করেছে কি বলেন?

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—পুলিশের চাকরি ক'রে চারশ' টাকা মাইনে পায় তো। তা'হলে ইনস্‌পেক্টরের র‍্যাঙ্কই হয়।

সুধীর মুখোটি বললো,—ডি.এস.পি তো বললেন ঠিকই করেছে স্যালুট ক'রে।

কুজুর বললো,—কিন্তু কুকুর তো।

—তা হ'ক। গজেন্দ্র বললো, সে সব কথা যাক, আমি ভাবছি তোমার মতো লাকি আর কে?

—লাকি?

—যা নয়তো কি বলো। তুমি যে ঠিক আসামী ধরেছ তাতো প্রমাণই হ'লো।

—কুকুরটাও তো লাকি।

—না, স্যার, ওকে ঠিক লাকি বলা যায় না। ওর ক্ষমতাই ঐরকম। সুধীর মুখোটি হাসতে হাসতে বললো।

—তা হবে। কুজুর বললো। কি ভাবলো সে।

গজেন্দ্র বললো,—ভাগ্যবান, সব দিকেই তোমার ভাগ্য কুজুর।

এ কথা বলার সময়ে গজেন্দ্রর মনে কুজুরের মেমবউএর কথাও ভেসে উঠেছিলো।

কুজুর বললো,—আসামীর হাতে কিন্তু একটা হলুদ কাপড়ের পটি বাঁধা ছিলো। ঘরের সবাই প্রায় সমস্বরে বললো,—তাতে কি?

—আর কারো হাতে কিন্তু তা বাঁধা ছিলো না।

এ.এস.আই সুধীর বললো,—সে তো যাতে আসামীর গায়ে দাঁত বসিয়ে না দেয় সেজন্যে। কুজুর ভাবতে লাগলো।

গজেন্দ্র মনে করলো এটা তার হিংসা হ'তে পারে। একটু একটু হিংসা তারও তো হচ্ছে।

পরের দিন সকালে ওদের চ'লে যাওয়ার আগে আংটি ছুরি রুমাল লুকনো এসব খেলা হবে। এটা থানার হাতাতেই হয়েছিলো। তার মূলে গজেন্দ্রর একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিলো। ক্যাথলীন কাল খুনী সানক্ত করার পর যখন গজেন্দ্র বাড়িতে ফিরলো তখন তার ছেলে দুটি যুযুধমান অবস্থায়। ব্যাপারটা ক্যাথলীনকে নিয়েই। বড় ছেলে বলেছে, ক্যাথলীন টেবিল চেয়ারে ব'সে খানা খায়। ছোটছেলে তা মানতে রাজি নয়। ছোটছেলে বলেছ ক্যাথলীন টিপসই দিয়ে মাইনে নেয় বাবার চাইতেও অনেক বেশি। বড়ছেলে বলেছে—বাবার চাইতে বেশি মাইনে পেতে পারে তাই বলে আঙুল যার নেই সে টিপসই দেবে তা মানা যায় না। কিন্তু এসব কারণ নয়। গজেন্দ্রর পত্নী বলেছিলো, তোমাদের কুকুরটি বেশ দেখতে। দেখেছ নাকি? হ্যাঁ। বড়ছেলে বললো—বলো তো কিরকম দেখতে? কেন বাদামি রং। ল্যাজটা ঝাঁকরা। ছাই দেখেছ ওটাতো থানার নেড়িটা। রাত্রিতে পত্নী অভিমান করলেন। অভিমানের মূলে বক্তব্য জীবনে সব কিছু থেকেই তিনি বঞ্চিত। একটা এরোপ্লেনে পর্যন্ত চড়েন নি। কি দেখেছেন, কি শুনেছেন? কাজেই গজেন্দ্রকে ব্যবস্থা করতে হ'লো থানার হাতাতেই যাতে খেলাটা হয়।

খেলা সুরু হ'লো। তার আগে ডি.এস.পি একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। তার সারমর্ম এই রকম : মানুষ অনেক কিছু করতে পারে বটে কিন্তু যন্ত্র সেই অনেক কিছু করাকে সহজ করেছে, নিশ্চিত করেছে। ঘড়ি সময় দেয়, এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে এগুলো ভেল্কি নয়। ক্যাথলীন চোর ধরে খুনী ধরে তাও ভেল্কি নয়। বিজ্ঞানবিদ্‌রা বলেন ইত্যাদি। এখানেই মানুষের উপরে যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্যাথলীনের মতো প্রাণীদেরও।

তার পর খেলা সুরু হ'লো। তিনঝোরা চা বাগানের মেমসাহেব নিজের আংটি খুলে দিলেন, কিন্তু কে তা চুরি করবে। কারোই যেন সাহস হয় না। অবশেষে যে এগিয়ে এলো সে কুজুর। আংটিটা গোপনে তার হাতে দেয়া হ'লো। সে যখন গজেন্দ্রর পিছন দিয়ে চ'লে যাচ্ছে তখন গজেন্দ্র ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো,—দেখো বাপু, কঠিন কিছু করো না।

—কেন, পারবে না মনে হচ্ছে? কুজুর হাসলো—ফ্যাকাসে মুখে।

—ঠিক তা নয়। তবে—

গজেন্দ্রর মনের অবস্থা ভাই পরীক্ষা দিচ্ছে এমন একজন দাদার মতো। কুজুর কত কিই করলো অনেক মিনিট ধ'রে ভিড়ের মধ্যে গ'লে, এদিকে ওদিকে চ'লে, এক পথে দু'বার তিনবার ঘুরে, পায়ে পায়ে গোলক ধাঁধা রচনা করে অবশেষে সে কনস্টেবলদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্যাথলীনকে ছাড়া হ'লো। মেমসাহেবের হাতটাকে কয়েক-বার শুঁকলো সে তারপর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কুজুরের লুকোতে বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিলো, ক্যাথলীনের দু'মিনিটও লাগলো না। দ্বিতীয় খেলা সুরু হ'লো যখন দর্শকদের আনন্দ কোলাহল তখনও মিলিয়ে যায় নি। ডি.এস.পি বললেন, এবার আমার পকেট থেকে কেউ রুমালটাকে সরিয়ে নিয়ে দু'শ গজের মধ্যে কোথাও থাকুন। তাই তো, এ খেলাটা কি করে হবে? ডি.এস.পি-র পকেট থেকে রুমাল সরাবে কে? কেউ আর এগোয় না। অবশেষে ডি.এস.পি বললেন, তা'হলে আপনারা কেউ আসুন, আমার পিছনে দাঁড়ান, রুমালটা আমি বার ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখা গেলো রুমালটা সত্যি নেই। কি আশ্চর্য, কে নিলো? ডাকবাংলোয় রেখে এসেছেন? তখন ক্যাথলীনের সঙ্গী বললো, ক্যাথলীনই বলুক। ডি.এস.পি-র পকেট শুঁকিয়ে ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া হ'লো। এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো সে। একটু যেন দিশেহারা ভাব। গজেন্দ্রর বুকের ভিতরটায় ধক্‌ ক'রে উঠলো, তা হ'লে এবার কি ক্যাথলীন পারবে না? কিন্তু ক্যাথলীন তো মানুষ নয়। যন্ত্রের মতোই নির্ভুল। থানার হাতা পার হয়ে, থানার ঘরের মধ্যে ঘরে, থানার বাড়িকে কয়েক পাক ঘুরে সে সোজা থানার কর্মচারীদের কোআর্টার্সের দিকে দৌড়লো। সে কি কোথায় যায়? এবার আর পারবে না। দেখা যাক না কি হয়। জনতা স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র। ক্যাথলীন কুজুরকে নিয়ে এলো তার কোয়ার্টার থেকে। ইতিমধ্যে কুজুর তার পোশাক বদলেছে। সাদা ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্ট পরেছে তা সত্ত্বেও তার মুখের চেহারাটা দস্তুর মতো অপরাধীর। ডি.এস.পি বললেন সমবেত জনতাকে—আর কিছু প্রমাণ চান আপনারা? জনতা নিরুত্তর। গজেন্দ্র বললো,—দেখো, কুজুর, তুমি কিন্তু আর এগিয়ো না। ভালো দেখায় না।

—কেন, বারবার তিনবার। কুজুর বললো।

—তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো না?

কুজুর বললো,—আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গজেন্দ্র অবাক হ'লো। কুজুরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে।

গজেন্দ্র বললো,—শত হ'লেও কুকুরটা তো আমাদের ডিপার্টমেণ্টেরই। ফেটিগ ব'লে তো কিছু আছে।

ডি.এস.পি-ও বললেন,—কি কুজুর আবার নাকি?

আর একবার খেলা হ'লো। এবারও ফাউণ্টেনপেনটা গাছতলা থেকে এনে দিলে ক্যাথলীন।

খেলা শেষ হয়েছে কিন্তু জনতার ভিড় ভাঙছে না। ডি.এস.পি সিগার ধরালেন। পুলিশ অফিসাররা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। খুশী মনে যেমন কথাবার্তা হ'য়ে থাকে।

ডি.এস.পি হাসিমুখে বললেন,—কুজুরও আজ অনেক বুদ্ধি দেখিয়েছে।

এস.ডি.পি.ও বললেন,—কিন্তু হারলো তো।

প্রকৃতপক্ষে কুজুর যেন ক্যাথলীনের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষাই দিয়েছে। থানার ঘরে এসে বসলেন ওঁরা।

এর পরে ডি.এস.পি থানার কনস্টেবলদের সঙ্গে দুএকটা ক'রে কথা বলতে লাগলেন। তারা সকলেই স্যালুট ক'রে এসে দাঁড়াতে লাগলো। তারপর ডি.এস.পি-রা গেলেন গজেন্দ্রর কামরায় খুনের তদন্ত রিপোর্টটা আলোচনা করার জন্যে।

একটা রেজিস্টার নিতে গজেন্দ্র এসেছিলো এই ঘরে। সকলের অলক্ষ্যে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো। বলা যায় না, হঠাৎ যদি কোন খুঁত কারো চোখে পড়ে। এটা চাকরিও তো বটে। সে দেখলো দত্তগুপ্ত এবং কুজুর গল্প করছে মুখোমুখী বসে।

—কি ব্যাপার?

দত্তগুপ্ত বললো,—কুজুর সাহেব বলছেন, ক্যাথলীনের সঙ্গী যে তাকে শিকল ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে নি তার প্রমাণ কি।

—হাউ অ্যাবসার্ড, কি যে বলো কুজুর। কিন্তু তোমার পরনে এখনও সিভিল ড্রেস।

কুজুরেরও খেয়াল হ'লো। সে পোশাক বদলাতে গেলো।

থানার দরজার সামনে তখনও ভিড়। কারণ ক্যাথলীন একটা চেয়ারে উঠে বসেছে। তার গায়ের পশমগুলো চক্‌চক্‌ করছে ঘামে। জিভ ঝুলিয়ে সে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

গজেন্দ্র বললো,—আচ্ছা, মোহিত, তোমরা সাহিত্য করো। মনস্তত্ত্বের কথা নিশ্চয়ই জানো। বলতে পারো কুকুর যা করলো তা সম্ভব হ'লো কি করে?

—কি করলো তা বলো আগে।

—নতুন ইস্ত্রি করা পোশাক পরে কুজুর থানায় ফিরলো। তার পোশাক পরাটার বৈশিষ্ট্যই এই সব সময়ে তা সদ্য ইস্ত্রি করা। বোধ হয় তার মেমবউএর হাতের কাজ। যাক সে কথা। পোশাক প'রে হাসতে হাসতে সে যখন থানার ঘরে ঢুকছে তখন সে ঘরে তার উপরওয়ালা কেউ ছিলো না। ক্যাথলীন অবশ্য ছিলো চেয়ারের উপরে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা জনতা তাকে দেখছে। তাদের দিকে চেয়ে সে তখনও জিভ লক্‌লক্‌ ক'রে হাঁপাচ্ছে। দরজা পেরিয়ে ঘরে পা দিয়েই জুতো ঠুকে স্যালুট করলো কুজুর।

—কাকে, ক্যাথলীনকে? কনস্টেবলদের মতো সেও কি ক্যাথলীনকে উপরওয়ালা মনে করেছিলো।

গজেন্দ্র বললো,—এটা, অবশ্য, এমন হ'তে পারে যে তার বিবেক শান্ত হচ্ছিলো না এমন কিছু না ক'রে?

—কেন, কেন?

—সকালের খেলার সময়ে সে ক্যাথলীনকে জব্দ করার জন্য কম চেষ্টা করে নি।

—এটা কন্‌ডিসানড্‌ রিফ্লেক্স্‌ও হ'তে পারে। পোশাকের ইন্দ্রির সঙ্গে যার যোগাযোগ আছে। কিন্তু গল্পটা বলো।]

গজেন্দ্ররা এই ডামাডোলে ভুলেই গিয়েছিলো হাজতে একজনকে ধ'রে রাখা হয়েছে। এবার সে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে যেন চাপা গলায় কাশলো। দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বলা বোধ হয় ঠিক নয়। কাল রাত্রিতেও যখন গল্প হচ্ছিলো তখন হাজতী আসামীও শিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গল্প শুনেছিলো। এ.এস.আই সুধীর মুখোটি তার খাবার ব্যবস্থাও করেছিলো। কাশির শব্দ শুনে কুজুর ফিরে দাঁড়ালো। মনে হ'লো সে যেন কিছু বলবে। কিন্তু কিছু না ব'লে বরং ভাবতে লাগলো সে মুখ নিচু করে।

ডি.এস.পি ও এস.ডি.পি.ও তদন্তের রিপোর্ট পড়া শেষ করে উঠলেন। তাঁরা লাঞ্চে যাবেন ডাকবাংলোয়। লাঞ্চ শেষ হ'লেই জিপ রওনা হবে। ইনস্‌পেক্টর থাকবেন বাকি তদন্ত পরিচালনার জন্য। ক্যাথলীনকে তারা থানা থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণে যত লোকে পারে দেখে নিক।

ওঁরা বেরিয়ে যেতে গজেন্দ্র থানার ঘরে এলো। কুজুর একটা চেয়ারে ব'সে বাজে কাগজ ছিঁড়ছে কুটিকুটি করে।

গজেন্দ্রর মন ভালো ছিলো। ওঁরা আসবার সময়ে সে কুজুরকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো। এখন তা প্রয়োজন বোধ করলো না। বললো, খাওয়া দাওয়া ক'রে নাও কুজুর। ওদের সঙ্গেই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাও তুমি। আর হাজতী আসামীর চালান লিখে দিচ্ছি ওকেও রওনা ক'রে দাও।

এই ব'লে গজেন্দ্র নিজের কামরায় ঢুকে হাজতী আসামীর চালান লিখতে বসলো। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকানো হয়েছে। সেটা ঢাকতে হবে।

কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যেই তাকে অবাক হ'য়ে লেখা ছেড়ে উঠতে হ'লো। কে যেন কাকে মারছে, প্রচণ্ডভাবে মারছে। কাঁদছে কেউ।

থানার ঘরে ঢুকে গজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাজতের দরজা খুলে ঢুকেছে কুজুর, আর নির্দয়ভাবে মারছে আসামীকে একটা বেল্ট দিয়ে।

—আহা করো কি, করো কি, ব'লে গজেন্দ্র এগিয়ে গেলো। মারছো কেন মিছামিছি। কুজুর আরও কয়েকটা চড় মারলো আসামীর গালে। হুহু ক'রে কেঁদে উঠলো সে।

গজেন্দ্র কুজুরকে প্রায় ঠেলে বার ক'রে দিয়ে হাজতের দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। গম্ভীর গলায় বললো, খেয়ে নাওগে। সাহেবদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

কুজুর মুখ তুলে তাকালো। অবাক লাগলো গজেন্দ্রর—এ যেন অন্য কোন কুজুর।

এখানে গজেন্দ্রর গল্প বাধা পেলো। ওদের যান্ত্রিক গোলোযোগ পার হ'তে পেরেছে। ডিনার দেয়া হচ্ছে খবর এলো।

বললাম,—বেশ কথা, কিন্তু কুজুর হঠাৎ আসামীটাকে মারলো কেন?

গজেন্দ্র বললো, এ নিয়ে তদন্ত হয়েছিলো। সুধীর মুখোটি বলেছিলো—কুজুর যখন ক্যাথলীনকে স্যালুট করে তখন আসামী হেসেছিলো। আসলে সেটা তার কাশি নয়।

—আর কুজুর তাকে বিদ্রূপ মনে করেছিলো!

ডিনারের টেবিলে যাওয়ার জন্য উঠলাম।

যেতে যেতে গজেন্দ্র বললো,—অসম্ভব নয়। কুজুর তখন অদ্ভুত ব্যবহারই করেছিলো। সাহেবরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন কিন্তু কুজুর নেই। তাঁরা দু'এক মিনিট অপেক্ষা করলেন তবুও তার দেখা নেই। অবশেষে তারই স্কুটারে ক'রে সুধীর মুখোটি গেলো খেয়া ঘাট পর্যন্ত ওঁদের এগিয়ে দিতে।

—তার বাসায় খোঁজ করা হ'লো না কেন?

—কি যে বলো, মোহিত? সে কি বাসায় ছিলো। সেদিন তার পরের দিনও তাকে পাওয়া গেলো না। ওদিকে ঘাড়ের উপরে ইনস্‌পেক্টর ব'সে। অথচ ডিউটি থেকে ছুটিও নেয়নি। ডেজার্টার ব'লে প্রসিডিংস করার কথাই ভাবছে ইনস্‌পেক্টর।

—কেমন একটু লাগছে না? চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম।

—তা লাগার কথাই। কুজুরের রক্তে, সে খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও, এমন কিছু ছিলো যা আমাদের থেকে পৃথক। একটা কুকুর কিম্বা একটা যন্ত্র মানুষের চাইতে বড় হ'তে পারে এ মেনে নিতে হ'লে যথেষ্ট সভ্য হওয়া দরকার। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে আদিবাসী রক্ত ছিলো।

সুপ নাড়তে নাড়তে গজেন্দ্র বললো, কিন্তু কুজুরের জন্য তুমি দুঃখ ক'রো না। তাকে পাওয়া গিয়েছিলো। কিম্বা তৃতীয় দিনে সে নিজেই ফিরে এসেছিলো তখন ভোর রাত হবে, এই বলে সেদিনের পাহারাদার। উস্কো খুস্কো চুল, ময়লা পোশাক। কিন্তু লাল চোখ দুটিতে অনিদ্রার ক্লান্তি থাকলেও তা শান্ত।

—প্রসিডিংস হ'লো তো।

গজেন্দ্র হাসলো। চিকেন ফ্রাইটা বেশ করে কিন্তু। সেসব কিছুই হয়নি। চোখ দিয়ে সে ইঙ্গিত করলো। বললো,—ইনস্‌পেক্টরই তো ছিলেন সেখানে। কুজুরের বাসায় ছিলেন। তার খোঁজও করছিলেন। স্থিতীয় দিনে কুজুরের মেমবউকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজে বেড়ালেন কুজুরকে। কুজুরের মেমবউএর গায়ে বেশ দেখাচ্ছিলো সবুজ রঙের নিচু গলার জামাটা। তখন গরম কাল তো। কুজুর যে সকালে ফিরে এলো সেদিন ইনস্‌পেক্টর থানায় এলেন প্রায় আটটা নটায়। প্রাতরাশ হয়েছে তার ইতিমধ্যে। খুব পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিলো তাকে।

—তার পরিতৃপ্তিটা কি সন্দেহজনক ছিলো?

—গভীর বলতে পারো। অত গভীর হওয়া সেই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নয়। আর এমন সময়ও কেউ কোনোদিন এই ইনস্‌পেক্টরকে দেখেনি। কুজুর চাকরি করবে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন হাসতে হাসতে। কুজুর বললো—করবে সে।

বললাম,—মানে—

গজেন্দ্রর মুখ তখন ঝলসানো মুর্গীতে ঠাসা কাজেই সে কি বললো স্পষ্ট বোঝা গেলো না। মনে হ'লো সে বলছ—চাকরি, টাকা, সমাজে স্থিতি এসব মিলে গোটা সামাজিক জীবনই একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহ করার চেয়ে মেনে নেয়া ভালো। কিন্তু ঠিক একথাই বললো কিনা সে তা হলপ্‌ ক'রে বলা যায় না।

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের যে আসন ও গুরুত্ব নির্ধারিত ও স্বীকৃত হয়েছে, তার সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও শিশুদের জন্য রচনার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। 'শিশু' বলতে বয়সের কোন্ সীমা, আর শিশু-সাহিত্য বলতে কি জাতীয় রচনা বোঝায়,—এই সব প্রসঙ্গ তর্ক-সাপেক্ষ। তার মধ্যে তত্ত্বকথা, নীতি-উপদেশ বা হিত-বচন থাকা উচিত বা অনুচিত কিনা, এককথায় তার উদ্দেশ্য ও রচনাভঙ্গী নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং এখনও তার নূতনতর অবকাশ আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সেটা হচ্ছে, শিশু-সাহিত্যের প্রাণবস্তু হল তার আবেদন, কৌতূহল জাগানোর ক্ষমতা, ভাষার সাবলীল স্বচ্ছতা, বোধগম্যতা এবং সব চেয়ে বড় কথা—তার চিত্তজয় করার শক্তি বা মনোহারিত্ব।

বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের যে প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তার সমাজ-সম্মত প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করে নেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই আনন্দের কথা। ব্যাপারটা দু দশ বছরে ঘটেনি, লেগেছে একশো বছরের ওপর। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে মার্শম্যান সাহেব "দিগ্‌দর্শন" নামে কিশোর-পাঠ্য যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাকে বাংলায় শিশু-সাহিত্যের আদিপুরুষ বলা চলে। এতে ইতিহাস ও বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল। "দিগ্‌দর্শনের" অনুজ হল "পশুবলী"—১৮২২ সালে প্রকাশিত জীবজন্তুর বিবরণ নিয়ে লেখা আর এক শিশুপাঠ্য পত্রিকা। নানা শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে নীতিবাক্য আর উপদেশের মাধ্যমে যে বস্তুর উদ্ভব, তারই আনন্দময় রূপান্তর ও পরিণতি লক্ষ্য করি ১৯১৩ এবং ১৯২০ সালে প্রকাশিত "সন্দেশ" ও "মৌচাকে"। এই শতাব্দী-কালের মধ্যে শিশুদের উপযোগী সাহিত্য নিয়ে বহু তর্ক আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যার ফলে শিশু-সাহিত্যের বর্তমান বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এবং সেই বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় একাধিক সাহিত্য-রথী সহৃদয় বিবেচনা-শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আজ যে মন ও দৃষ্টি নিয়ে ছেলেমেয়েরা বই পড়ে ও আনন্দ পায়, আর যে মন আর দৃষ্টি নিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা সেসব বই সমাদরে উপভোগ করেন কিংবা তাঁর সমালোচনা করেন, তার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক পথিকৃৎ হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা অবশ্যই দাবি করতে পারেন। ঐতিহাসিক কারণেই বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যাঁর কৃপায় শিশুদের বর্ণপরিচয় ঘটেছে, গোপাল-রাখাল-ভুবনদের কথা সহজ ও সুখপাঠ্য গল্প হিসেবে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে আর কথামালার জীবজন্তুদের সঙ্গে হৃদয়বিনিময় হয়েছে। এর পরবর্তী যুগে শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আনন্দ-রস পরিবেশন সম্পর্কে এত কথা বলা যায় যার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথির প্রয়োজন। তারপর যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ আর সর্বশেষে সুকুমার রায়—এই পাঁচজন লেখক এমন জিনিস দিয়েছেন যার জন্য বাংলার পাঠক-পাঠিকা চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবে।

শিশু-সাহিত্য সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ এবং নিতান্ত অপ্রধান অঙ্গ নয়। ঘুটে-কুড়ুনী বা সিণ্ডেলার গল্পের রকম-ফের সব দেশেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে শিশু-সাহিত্য দুঃস্থ অনাত্মীয়ের সামিল নয়। বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, মহৎ সাহিত্য যে দেশে রচিত হয়েছে, সেখানে শিশু-সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, সেই জীবনের অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটা বড় অংশ হল শিশুদের জীবন, শিক্ষা ও আনন্দ। একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত কৌতুকজড়িত ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা সুরে যদি সেই শিশু-সাহিত্য রচিত হয়—যেমন আমাদের দেশে কোনও কোনও বইয়ে দেখতে পাই, তাহলে বলতে হবে এতে শিশুদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত অনেক জিনিস অবহেলা করে, তাদের নগণ্য জীব মনে করে রীতিমত অবমাননা করা হয়। এর ফলে যে ধরনের সাহিত্য রচিত হয়, তা কিছুটা অবাস্তব। তাচ্ছিল্যের দাক্ষিণ্য। আধো-আধো কৃত্রিম আদুরে কথা হলেই তা শিশু-সাহিত্যের ভাষা হয় না।

আসল কথা এই যে কাঠামোটা যেমন দরকারী, তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরও দরকারী। এবং সে কাজটি সহজ নয়। কত যত্নে নিষ্ঠায় বিবেচনায় শিশুদের জন্য বই লিখতে হয়, তা পড়ে ভেবে ঠিক করতে হয়। শিশুদের জগৎ খানিকটা খাপছাড়া বলেই তাদের মন আচরণ সব খাপছাড়া—এমন মনে করবার কোনও ন্যায্য কারণ নেই। বড়দের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং পুরোপুরি নিঃসম্পৃক্ত একটা জগতে শিশুরা বাস করেনা। আকারে-প্রকারে মিনিয়েচার বলেই, তাদের সবটুকু মন খণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত নয়। তাদের হৃদয়েও বড় ভাবের ঢেউ জাগে, মন দোলা খায় কল্পনার আবেগে—যে কল্পনা সব সময়ে অসংলগ্ন নয়। এমন কি কিছু পরিমাণে অসংলগ্ন হলেও, সে কল্পনার প্রসার ও সঞ্চার আমাদের বয়স্কের কাছেও বিস্ময়কর। শিশুদের চিন্তায় ধারণায় এক ধরনের লজিক আছে। সেই লজিক মিনি শিশুদের মন নিয়ে বুঝেছেন এবং ফোটাতে শিখেছেন, তিনিই প্রকৃত লেখক। ক্যারল এবং ডিকেন্‌স্, স্টীভ্‌ন্‌সন এবং ডী লা মেয়ারের বিশেষ ধরনের রচনাগুলির কথা ভেবে দেখলেই কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হবে। করুণা করে নীচে নেমে এসে পিঠ চাপড়ানোর যেমন দরকার নেই, হাওয়াই জাহাজে অকালপক্ক কিশোরদের তেমনি কোনও পার্বত গুহাঁপের গভীর জঙ্গলে গুপ্তধনের গোয়েন্দাগিরি করবারও প্রয়োজন নেই। অবাস্তব এড্‌ভেঞ্চার যেমন অর্থহীন, ক্রমাগত ছানাবড়া খাওয়ানোও তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

শিশু ও কিশোরদের মন নিয়ে যতটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা করে থাকি এবং পরিসংখ্যান রচনা করেছি, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব অ্যাপ্‌টিট্যুড টেস্ট, অবজেকটিভ টেস্ট প্রচলন করেছি, সেই অনুপাতে কিন্তু বই লিখিনি। অর্থাৎ সেই অনুপাতে শিশু-সাহিত্য কৌলীন্য অর্জন করেনি। শিশুদের শিক্ষা আর তাদের উপযোগী সাহিত্য নিয়ে পরিকল্পনা ও সৃষ্টি, থিওরি ও প্র্যাকটিসে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দুই পদার্থের সমন্বয় করেছেন বলে জানা নেই আমাদের দেশে। শিশু ও কিশোরদের সুখদুঃখটা কোথায়, কি ধরনের; অবকাশ-আনন্দ-বর্জিত শুষ্ক শৃঙ্খলার চাপে তাদের মানসিক প্রসার কিভাবে সঙ্কুচিত ও ক্ষুণ্ণ হয়, তা তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন। ফলে ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর সব রচনা নিখুঁত শিশু-সাহিত্য না হোক, তাঁর ভাষা তাঁর ছন্দ তাঁর কথার ছবি কল্পনাপ্রবণ ছোটদের মনকে চিরকালই দোলাবে। বয়স পার হলে, প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছুলে, বয়স্ক মন আরও দুলবে।

রবীন্দ্রনাথ যে মন ও দৃষ্টি নিয়ে শিশুদের কথা বুঝতে চাইলেন ও প্রকাশ করতে ব্যগ্র হলেন, সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। তাঁর শিশুকালের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শিশুপাঠ্য বই ছিল অনুবাদ-প্রধান ও নীতি-মূলক। স্কুল বুক সোসাইটির আমল থেকে বিদ্যাসাগরের আমল পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক সুন্দর ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে খগেন্দ্র মিত্রের বইয়ে। বাংলা সাহিত্যের তত্ত্বসন্ধানী পাঠকের কাছে এ বইখানি বিশেষ মূল্যবান্, কারণ অনেক যত্ন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সে সব তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিশু-সাহিত্যের কারুকর্ম ও বিষয়-বস্তুর একটি সম্পূর্ণ আলোচনা এখনও অলিখিত রয়েছে। পারতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাঁর চোখ-কান মগজ ও প্রাণ সবচেয়ে উপযুক্ত এই কাজের জন্য। যাই হোক, উনিশ শতকে স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কাছে আমরা ঋণী। তাঁরা শিশু-সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা করেননি। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তাঁরা যে সব বই প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাদের মূল্য যাচাই করতে গেলে সে কালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ মনে রাখা উচিত। "নীতিকথায়" 'দুই কুকুড়া' কিংবা 'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ' প্রভৃতি গল্পের যে ভাষা ও ভঙ্গী, তা আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা পড়ে হেসেই খুন হবে, যেমন—

'দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল আর একটা অন্য স্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝটকাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া লইল।

ইহার তাৎপর্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।' লজ্জা যে-ই পাক্, 'জিনিবার' আহ্লাদটা খুবই ন্যায্য।

কিংবা

'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পূর্ণ ছিল।'

এ পর্যন্ত কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তারপর যে ভাষা, তা যাদুঘরের কৌতুক-সামগ্রী, যথা—

'তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা উদর পূর্ণ হওন পর্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল, সুতরাং চামড়া খাইতে পারিল না।'

গল্পটির নৈতিক তাৎপর্য যাই হোক—এর ভাষা সংস্কৃতবহুল নয়। এতে যতি-চিহ্ন আছে, পড়ে মানে বুঝতে কোনও কষ্ট নেই। কিছু মজা আছে, আর আছে ঐ অকাট্য যুক্তি—'পেট ফাটিয়া' মরিলে 'চামড়া খাইতে' জায়গার অভাব হয়!

যাই হোক, "বালকবন্ধু" পত্রিকাতেই বোধ হয় সত্যিকারের শিশু-সাহিত্যের জন্ম হয়। ঠিক আশী বছর আগে এটি পাক্ষিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়ে বেশ কিছুকাল জীবিত ছিল। প্রকাশিত রচনাগুলির ভাষাও সেকালের পক্ষে অনেকটাই আধুনিক ছিল। ছবি থাকত, হাস্যকৌতুকের অভাব ছিল না আর বাংলাও ছিল সহজ এবং পরিচ্ছন্ন। অন্ততঃ

"অযোধ-বন্ধু"র চেয়ে "বালকবন্ধু"র আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো, যদিও "জীবন-স্মৃতি"তে দেখি ঐ পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত পল-ভার্জিনিয়ার তর্জমা পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রচুর মনের খোরাক পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল "সখা" (পরে "সখা ও সাথী")। প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রথম লেখা ছোটদের উপন্যাস এবং নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এই পত্রিকাটি শুধুই ছোটদের চিত্তজয় করেনি, পরবর্তী কালের জন্য একটি আদর্শও রেখে যায়। কিশোর উপেন্দ্রকিশোর এ কাগজে লিখতেন এবং বোধহয়, "সন্দেশ" বার করবার সময় "সখা"র স্মৃতি তাঁর মনে যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল।

এর পর পনের কুড়ি বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের মান ক্রমশই উন্নত হয়ে ওঠে। ছাপায় ছবিতে ও রচনায়; উপন্যাস গল্প নিবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য-সজ্জায় শিশু-সাহিত্য তার স্বকীয় চরিত্র ও উৎকর্ষ অর্জন করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে বেরুল "বালক", যে কাগজে ছড়া কবিতা গল্প হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালী-নাটক এবং "রাজর্ষি" উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। তারপর এল "সাথী" ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। এ কাগজে ছোটদের লেখা প্রকাশ করা হত এবং শিশু-সাহিত্যের দিক্‌পাল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর লেখা দিতেন। উপেন্দ্রকিশোরের একটি সরস সচিত্র নাটিকা (বেচারাম ও কেনারাম) বেরিয়েছিল সপ্তম সংখ্যায়, এটি "সন্দেশের" নূতনতম পর্যায়ে অনায়াসে পুনর্মুদ্রণ করা যায়। এক বছর পরে "সাথী" যুক্ত হল "সখা"র সঙ্গে। তার পরই বেরুল "মুকুল" ১৮৯৫ সালে। এই পত্রিকায় লেখেননি এমন বিখ্যাত মনীষী লেখক কেউ নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যমে ও সম্পাদনায় "মুকুল" যে নাম ও স্মৃতি রেখে গেছে, তাতে কাগজখানিকে ল্যান্ডমার্ক বলে গণ্য করা চলে। উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে বলতে হয়, *সুকুমার রায় আট বছর বয়সে 'নদী' নামে একটি কবিতা লেখেন "মুকুলে"। 'মুকুল' নামটি সত্যিই সার্থক ছিল এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখেছিলেন —'মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এই জন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ; মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে...', তা নিতান্ত সত্য, শুধু প্রস্তাবনা বা প্রচার নয়। ফলটা যে ভালই হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আঠার বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল। প্রথমে "তোষিণী", তার পর "শিশু" এবং "সন্দেশ"। "সন্দেশ"ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ফুল ও ফল। সুগন্ধে রসে ও স্বাদে শুধু ফুল ও ফল নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি অর্থাৎ একাধারে ক্ষুধা ও খাদ্য—রুচিকর ও পুষ্টিকর। "সন্দেশে"র প্রথম পর্যায়—যথাক্রমে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায়—ছিল এক বিস্ময়কর পর্ব, অন্ততঃ আমাদের সমকালীন পাঠকদের কাছে। তারপর "মৌচাক" থেকে সুরু করে "রংমশাল", কত কাগজ ভালো মন্দ এল গেল। শুধু "মৌচাক" টিঁকে আছে। কিন্তু "সন্দেশে" প্রকাশিত লেখাগুলির বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুনত্ব না থাকলেও, এর ছাপা ছবি অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা আর রায়চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র রচনা আমাদের কাছে যথেষ্ট বিপ্লবী ঘটনা বলেই মনে হত। এবং এখনও পর্যন্ত সেই ধারণাই বলবৎ আছে।

বস্তুতঃ "সন্দেশে"র সঙ্গে আমাদের বয়সী পাঠকের যে চিত্ত-সংযোগ ঘটেছিল, তার রেশ আজও মোছেনি। কথাটার মধ্যে নসটালজিয়ার আভাস থাকলেও শুধু স্মৃতিবিলাস নয়। এত বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছবি, এত মজা ও শিক্ষার বস্তু, এতগুলি শক্তিশালী লেখক-সমাবেশ একসঙ্গে আর কোথাও পাইনি। "সন্দেশে"র সম্পাদক পঞ্চাশ পেরিয়ে যে

রবীন্দ্রনাথ যে মন ও দৃষ্টি নিয়ে শিশুদের কথা বুঝতে চাইলেন ও প্রকাশ করতে ব্যগ্র হলেন, সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। তাঁর শিশুকালের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শিশুপাঠ্য বই ছিল অনুবাদ-প্রধান ও নীতি-মূলক। স্কুল বুক সোসাইটির আমল থেকে বিদ্যাসাগরের আমল পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক সুন্দর ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে খগেন্দ্র মিত্রের বইয়ে। বাংলা সাহিত্যের তত্ত্বসন্ধানী পাঠকের কাছে এ বইখানি বিশেষ মূল্যবান্, কারণ অনেক যত্ন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সে সব তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিশু-সাহিত্যের কারুকর্ম ও বিষয়-বস্তুর একটি সম্পূর্ণ আলোচনা এখনও অলিখিত রয়েছে। পারতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাঁর চোখ-কান মগজ ও প্রাণ সবচেয়ে উপযুক্ত এই কাজের জন্য। যাই হোক, উনিশ শতকে স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কাছে আমরা ঋণী। তাঁরা শিশু-সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা করেননি। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তাঁরা যে সব বই প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাদের মূল্য যাচাই করতে গেলে সে কালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ মনে রাখা উচিত। "নীতিকথায়" 'দুই কুকুড়া' কিংবা 'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ' প্রভৃতি গল্পের যে ভাষা ও ভঙ্গী, তা আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা পড়ে হেসেই খুন হবে, যেমন—

'দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল আর একটা অন্য স্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝটকাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া লইল।

ইহার তাৎপর্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।' লজ্জা যে-ই পাক্, 'জিনিবার' আহ্লাদটা খুবই ন্যায্য।

কিংবা

'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পূর্ণ ছিল।'

এ পর্যন্ত কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তারপর যে ভাষা, তা যাদুঘরের কৌতুক-সামগ্রী, যথা—

'তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা উদর পূর্ণ হওন পর্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল, সুতরাং চামড়া খাইতে পারিল না।'

গল্পটির নৈতিক তাৎপর্য যাই হোক—এর ভাষা সংস্কৃতবহুল নয়। এতে যতি-চিহ্ন আছে, পড়ে মানে বুঝতে কোনও কষ্ট নেই। কিছু মজা আছে, আর আছে ঐ অকাট্য যুক্তি—'পেট ফাটিয়া' মরিলে 'চামড়া খাইতে' জায়গার অভাব হয়!

যাই হোক, "বালকবন্ধু" পত্রিকাতেই বোধ হয় সত্যিকারের শিশু-সাহিত্যের জন্ম হয়। ঠিক আশী বছর আগে এটি পাক্ষিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়ে বেশ কিছুকাল জীবিত ছিল। প্রকাশিত রচনাগুলির ভাষাও সেকালের পক্ষে অনেকটাই আধুনিক ছিল। ছবি থাকত, হাস্যকৌতুকের অভাব ছিল না আর বাংলাও ছিল সহজ এবং পরিচ্ছন্ন। অন্ততঃ

"অযোধ-বন্ধু"র চেয়ে "বালকবন্ধু"র আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো, যদিও "জীবন-স্মৃতি"তে দেখি ঐ পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত পল-ভাজিনিয়ার তর্জমা পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রচুর মনের খোরাক পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল "সখা" (পরে "সখা ও সাথী")। প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রথম লেখা ছোটদের উপন্যাস এবং নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এই পত্রিকাটি শুধুই ছোটদের চিত্তজয় করেনি, পরবর্তী কালের জন্য একটি আদর্শও রেখে যায়। কিশোর উপেন্দ্রকিশোর এ কাগজে লিখতেন এবং বোধহয়, "সন্দেশ" বার করবার সময় "সখা"র স্মৃতি তাঁর মনে যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল।

এর পর পনের কুড়ি বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের মান ক্রমশই উন্নত হয়ে ওঠে। ছাপায় ছবিতে ও রচনায়, উপন্যাস গল্প নিবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য-সজ্জায় শিশু-সাহিত্য তার স্বকীয় চরিত্র ও উৎকর্ষ অর্জন করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে বেরুল "বালক", যে কাগজে ছড়া কবিতা গল্প হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালী-নাটক এবং "রাজর্ষি" উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। তারপর এল "সাথী" ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। এ কাগজে ছোটদের লেখা প্রকাশ করা হত এবং শিশু-সাহিত্যের দিক্‌পাল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর লেখা দিতেন। উপেন্দ্রকিশোরের একটি সরস সচিত্র নাটিকা (বেচারাম ও কেনারাম) বেরিয়েছিল সপ্তম সংখ্যায়, এটি "সন্দেশের" নূতনতম পর্যায়ে অনায়াসে পুনর্মুদ্রণ করা যায়। এক বছর পরে "সাথী" যন্ত্র হল "সখা"র সঙ্গে। তার পরই বেরুল "মুকুল" ১৮৯৫ সালে। এই পত্রিকায় লেখেননি এমন বিখ্যাত মনীষী লেখক কেউ নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যমে ও সম্পাদনায় "মুকুল" যে নাম ও স্মৃতি রেখে গেছে, তাতে কাগজখানিকে ল্যাণ্ডমার্ক বলে গণ্য করা চলে। উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে বলতে হয়, 'সুকুমার রায় আট বছর বয়সে 'নদী' নামে একটি কবিতা লেখেন "মুকুলে"'। 'মুকুল' নামটি সত্যিই সার্থক ছিল এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখেছিলেন —মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এই জন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ; মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে...', তা নিতান্ত সত্য, শুধু প্রত্যবনা বা প্রচার নয়। ফলটা যে ভালই হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আঠার বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল। প্রথমে "তোষিণী", তার পর "শিশু" এবং "সন্দেশ"। "সন্দেশ"ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ফুল ও ফল। সুগন্ধে রসে ও স্বাদে শুধু ফুল ও ফল নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি অর্থাৎ একাধারে ক্ষুধা ও খাদ্য—রুচিকর ও পুষ্টিকর। "সন্দেশে"র প্রথম পর্যায়—যথাক্রমে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায়—ছিল এক বিস্ময়কর পর্ব, অন্ততঃ আমাদের সমকালীন পাঠকদের কাছে। তারপর "মৌচাক" থেকে সুরু করে "রংমশাল", কত কাগজ ভালো মন্দ এল গেল। শুধু "মৌচাক" টিঁকে আছে। কিন্তু "সন্দেশে" প্রকাশিত লেখাগুলির বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুনত্ব না থাকলেও, এর ছাপা ছবি অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা আর রায়চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র রচনা আমাদের কাছে যথেষ্ট বিস্ময়কর ঘটনা বলেই মনে হত। এবং এখনও পর্যন্ত সেই ধারণাই বলবৎ আছে।

বস্তুতঃ "সন্দেশে"র সঙ্গে আমাদের বয়সী পাঠকের যে চিত্ত-সংযোগ ঘটেছিল, তার রেশ আজও মোছেনি। কথাটার মধ্যে নস্টালজিয়ার আভাস থাকলেও শুধু স্মৃতিবিলাস নয়। এত বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছবি, এত মজা ও শিক্ষার বস্তু, এতগুলি শক্তিশালী লেখক-সমাবেশ একসঙ্গে আর কোথাও পাইনি। "সন্দেশে"র সম্পাদক পঞ্চাশ পেরিয়ে যে

দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যম নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, তা অত্যাধুনিক কালেও তার আধুনিকত্ব হারায়নি। আমার মনে হয়, ১৯১২ থেকে ১৯২৫-২৬ সাল হ'ল শিশু-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ, যদি "সখা" ও "মুকুল"কে নব-জাগরণের অঙ্কুর বলে গণ্য করি। আমাদের শৈশবে ও বাল্যকালে পত্রিকা ও গ্রন্থ হাতের আঙুলে গোনা যেত। কিন্তু যেগুলি পেয়েছিলাম, তা যত্ন করে রাখার মতো সামগ্রী। ঠাকুমার ঝুলি, চারু ও হারু, টুনটুনির বই, গল্পের বই, আরও গল্প, হিন্দুস্থানী উপকথা। লেখকদের মধ্যে একদিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শিবরতন মিত্র, কালিদাস রায়, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত অপর দিকে শান্তা ও সীতা দেবী এবং রায়-পরিবার।

বর্তমানে শিশু-সাহিত্যের ভাব ভাষা ও বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, পরীক্ষাও হয়। বই অগুন্তি, ভালো মন্দ মাঝারি। ছড়া কবিতা রূপকথা উপকথা গল্প উপন্যাস ইতিহাস বিজ্ঞান প্রবন্ধ নিবন্ধ, কোনোটারই অভাব নেই। সক্ষম অক্ষম রচনায় অনুবাদে শিশু-সাহিত্য প্লাবিত। চোর-ডাকাত গোয়েন্দা-গুপ্তধন পাহাড়-জঙ্গল রোমাঞ্চ-রহস্যে আকাশ বাতাস ধূম্রাচ্ছন্ন। মনে হয়, শিশু ও কিশোররা কেন, আমরাই এত অপরিকল্পিত উদাসীন প্রাচুর্য-সৃষ্টিতে বিভ্রান্ত। ভূতের গল্প, অবিশ্বাস্য কাহিনী, ফ্যানটাসি ছোটদের হাতে দেওয়া যায় কিনা, এমন কি প্রচার-সাহিত্য কি ভাবে পরিবেশন করা চলতে পারে অথবা পারে না, তা নিয়েও তর্কের অন্ত নেই। শুনে হাঁপিয়ে উঠি আর ভাবি—মজতালী সরকারের কথা, সাত চোর আর পালোয়ানের কথা, রঘু ও বিশে ডাকাতের কথা, বেতাল পঞ্চবিংশতি ক্ষীরের পুতুল আর ভূতপতরীর কথা, দ্বিঘাংচু পাগলা দাশু আর হযবরল! মনে পড়ে 'খোকার দপ্তরে'র সেই কবিতাটা—

হলধর তর্কতীর্থ বলে দর্পভরে,—
আমি ভিন্ন সব মূর্খ পৃথিবী ভিতরে।
বর্ণে বর্ণে কত অর্থ আমার কথায়,
দীর্ঘ টীকি অনর্থক ধরি নি মাথায়!

এখন মাথাটা সত্য না টীকিটা বেশি সত্য, তা নিয়ে মারামারি চলুক। ইতিমধ্যে কথার ও বর্ণের যা অর্থ, তা নিরর্থক হতে চলল।

এখন সব সাহিত্যিকই 'শিশু-সাহিত্যিক' হয়ে উঠেছেন বা উঠছেন। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তবে মান আর রুচিটা যেন বজায় থাকে, যার সার্থক পরিচয় পেয়েছিলাম সন্দেশের পৃষ্ঠায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে একদা দাদা ধূর্জটিপ্রসাদ একখণ্ড কাগজ এনে দিয়েছিলেন—নামটা ছিল যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক—"সন্দেশ" এবং ভিতরটা আরও বেশি মনোহর। ঐ কাগজখানির মাধ্যমে রায়-পরিবারের লেখক-গোষ্ঠীর যে প্রতিভা বিকশিত হয়, তা সবাই জানেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল রায়, সুখলতা, পুণ্যলতা, কুলদারঞ্জন, সকলেই লিখেছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। শুধু সারদারঞ্জন রায় মহাশয় কিছু লিখেছিলেন কিনা মনে পড়ে না। তিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠ; কলেজী কর্তৃত্ব, সটীক শকুন্তলা ও রঘুবংশ, দাড়ি ও ক্রিকেট ব্যাট নিয়েই তাঁর দিন কেটেছে। নইলে সবাই লিখেছেন। প্রমদারঞ্জনের বন-জঙ্গল ও শিকারের কথা এই সেদিনও লোভনীয় লেগেছে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্প-প্রতিভা তো সুপরিচিত আর লীলা মজুমদার? সুকুমার রায়ের পর ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসি রচনায় তিনি নিজের তৈরি পথ রচনা করে নিয়েছেন, আশ্চর্য ক্ষমতায়। কৌতুক ও ভাইট্যালিটিতে ভরপুর তাঁর লেখা। তদুপরি

তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গী—খাঁটি টমবয়!

এ সব মিলিয়েই শিশু-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আরও উঠবে, যদি বই আর কাগজের প্রাকৃত সোঁদা গন্ধটা উড়িয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী গন্ধটা বর্ণচোরার মতন আসর জাঁকিয়ে না বসে। শিশুদের নিজস্ব সৌরভই হল শিশু-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ। মিষ্টি-মিষ্টি চটকদার সিনথেটিক এসেন্স দু চার দিন বাজার গরম করে, কিন্তু থাকে না। সংগতি আর অসংগতির মধ্যে, সেন্স ও ননসেন্সের মধ্যে যে অদৃশ্য উজ্জ্বল সম্পর্ক-সূত্র আছে, সেই সূত্রটি ধরে যিনি বিনা বিজ্ঞাপনে, অনাড়ম্বর সুমিষ্ট পন্থায় আনাগোনা করতে পারেন, তাঁর হাতেই শিশু-সাহিত্যের চাবিকাঠি।*

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* সন্দেশ ॥ মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক : সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সমালোচনা

Anabasis. *By* St.-John Perse. Translated *by* T. S. Eliot. Faber and Faber. London. 15*s*.

গত বছর স্যাঁ-ঝন প্যার্সের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ফরাসী আকাদেমীর সদস্য এক সাহিত্য-সমালোচক কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফরাসী হিসেবে গর্ব ও আনন্দ যে তাঁর হয়নি তা নয়, এমন কি কবি সম্বন্ধে প্রশংসার কথাও তিনি বলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ মনোভাবটা চাপা থাকেনি। ক্ষোভের কারণ, প্যার্সের কাব্য কার্তেজীয় ধারার বিরোধী। যুক্তি-বাদকে যিনি জাহান্নামে দিয়েছেন তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মানলাভে সমালোচক বিচলিত না বোধ ক'রে পারেননি। অবশ্য কার্তেজীয় ধারার জন্যে এ খেদ যতই আন্তরিক হোক, সময়ের হিসেবে একে তামাদি ব'লেই ধ'রে নিতে হয়। বিগত ও বর্তমান শতকের ফ্রান্সে বিভিন্ন কাব্য-আন্দোলনের উৎসারের পর এবং কীর্তিমান ফরাসী কবিদের বিচিত্র কাব্য-সৃষ্টির পর এরকম খেদের আর অবকাশ আছে কি? দেকার্তের মতবাদের প্রভাবে যে নিস্তার শৃংখলা, ধারণার সুনির্দিষ্টতা এবং প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা ফরাসী সাহিত্যের কুল-লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আজকের নয়। 'স্যা কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে' (যা প্রাঞ্জল নয় তা ফরাসী নয়), এই অষ্টাদশ শতকী উক্তির মহিমা অনেক কাল আগেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাকে এখন স্মরণ ক'রে ফরাসী মনকে একটি বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত করার চেষ্টা আর যাই হোক বাস্তব নয়।

উক্ত সমালোচকের ক্ষোভটা তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া, কিন্তু স্যাঁ-ঝন প্যার্সের কাব্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যথার্থ। প্যার্সের বিচরণ যুক্তিবাদের পথে নয়। এ বিষয়ে তাঁর নিজের ঘোষণাই প্রবল ও দ্বিধাহীন। কবিতায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন : "যুক্তিবাদী মানুষ যে-দৃষ্টি আঁকড়ে ছিল সে-দৃষ্টি ঘুচিয়ে যাক। যুক্তিতর্ক, তোমাকে আমি বিদায় দিলাম।.....আমাদের মধ্যে কবির কাজ বাণীকে পরিষ্কার করা। তার কাছে উত্তর আসে হৃদয়ের আলোকোদ্ভাসে।" যে-কবি হৃদয়ের আলোয় বিশ্বাসী, যুক্তির পারম্পর্যে নয়, স্বভাবতই তাঁর কবিতা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার ধার ধারে না। অর্থাৎ প্রচলিত বোধ্যতা তার নেই। প্যার্সের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ *Anabase* তার নিদর্শন।

নাম থেকে Xenophon-এর বিখ্যাত গ্রন্থের সংগে এর সম্পর্ক মনে আসে। কিন্তু সিরুসের অভিযানে গ্রীকদের অংশগ্রহণ এবং ইউফ্রাতিস পারের অঞ্চল থেকে গ্রীক উপকূল পর্যন্ত পশ্চাদপসরণের যে চমকপ্রদ বৃত্তান্ত Xenophon লিপিবদ্ধ করেছেন তা এই গদ্য-কাব্যের বিষয়বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশেষ কাহিনীই এতে নেই। কাহিনীর মতো যেটুকু আছে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। ফলে এ কাব্য অনুধাবনে কাহিনী নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া চলে না। লুসিয়াঁ ফাব্র্ গ্রন্থের দশটি অংশের প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ ক'রে যে-সারমর্ম দিয়েছেন তার প্রয়োজ্যতা সংকীর্ণ। সব কিছুকে তার সংগে মেলানো যায় না।

আসলে প্যার্সের কাব্যের প্রকৃতিই সরলীকরণের অন্তরায়। কোনো ঘটনাবিবরণ অথবা মনোবিবরণ তার বিষয় নয়। তা এক জাগতিক অবলোকন এবং সমন্বয়-অন্বেষার কাব্য, যার নাম কখনো হতে পারে Anabase, কখনো Exil, কখনো Amers, কখনো অন্য কিছু। এই অবলোকনে প্রতিভাত হয় সমস্ত স্থানকাল, সমস্ত মানুষ এবং সমন্বয়-ভাবনার অন্তর্গত হয় প্রাণী ও বস্তুপুঞ্জ। কবির কল্পনা ও মনন প্রতি মুহূর্তে বাস্তবকে রূপান্তরিত করে। কল্পনা, বাস্তব ও মনন, এই তিনের অবিচ্ছিন্ন মেলামেশায় প্যার্সের কাব্যের সমগ্রতা গড়া। তারা পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। প্রতি পদে বাইরের জগৎ এবং অন্তরের জগতের পরস্পর-প্রতিফলন। স্বভাবতই এ কাব্যের বাকবিন্যাস বিশ্লেষণসাপেক্ষ নয় এবং অর্থও বিশ্লেষণ নির্ভর নয়। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক কণ্ঠপ্রবাহ। থেমে থেমে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের মানে করতে গেলে খেই হারিয়ে যায়, কিন্তু তার একটানা স্রোতে ভেসে পড়লে আমরা এক নতুন চেতনার কূলে উত্তীর্ণ হই। হয়তো কবি-কথিত হৃদয়ের আলোক সম্পাতেই এমন ঘটে। এ কাব্যের পদ্ধতি-প্রকরণও এই চারিত্র্য অনুযায়ী। একের পর এক চিত্রকল্প, ক্রমাগত বস্তুর নাম, বহু বিচিত্র অভিধার ব্যঞ্জনা ঘটনার ইংগিত এবং শব্দের ধ্বনি। কিন্তু শূন্য বাগ্‌বৈদগ্ধ নয়। সমস্তর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল মূর্তি : মানুষের মূর্তি। তার কর্ম, তার স্বপ্ন, তার ভাগ্য সেখানে ধ্বনিত। তার অস্তিত্বে ও আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনে গ্রথিত প্রকৃতির প্রবল অভিব্যক্তি : সমুদ্র, মরুপ্রান্তর, বিপুল হাওয়া, বৃষ্টিধারা, তুষারবর্ষণ। বস্তুপুঞ্জের পৃথিবীতে, কর্মের পৃথিবীতে মানুষের নতুন প্রতিষ্ঠার সন্ধানে প্যার্সের কবি-দৃষ্টি একাগ্র। এ সন্ধানের মূলসূত্র তিনি আগুতভাবে তাঁর শেষ গ্রন্থ *Chronique*-এ উল্লেখ করেছেন। নিজের প্রাচীন বয়সকে (Grand âge) সম্বোধন ক'রে বলেছেন মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নিতে। কিন্তু যৌবনের কম্পিত প্রশ্নে এই একই কথার উচ্চারণ আমরা *Anabase*-এ শুনি : Tant de douceur au coeur de l'homme, se peut-il qu'elle faille à trouver sa mesure? (এত মাধুর্য মানুষের হৃদয়ে, তা কি তার পরিমাপ খুঁজে পাবে না?)।

Anabase-এ যে চলার ছবি আমরা দেখি তা দশ হাজার গ্রীকের অথবা বিশেষ কোনো লোকদলের নয়, সাধারণভাবে মানুষের। গ্রন্থের বিষয়কে কাহিনীর মতো ক'রে ভাবলে মোটামুটি এই রকম ভাবা যায় : কোনো বিজয়ী মধ্য এশিয়া পর্যন্ত অভিযান করলেন, তাঁর যাত্রাপথে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করলেন, শহর স্থাপন করলেন, প্রচলিত প্রথা উল্টেপাল্টে দিলেন এবং কর্মবিসানে সন্তোষ ও বিষাদের মধ্যে শুনতে লাগলেন সমুদ্রযাত্রার আহ্বান। কিন্তু এ কাহিনী কোনো বিশেষ কাল ও ঘটনার চিত্রণে আবদ্ধ নয়, এবং এশিয়ার প্রান্তরভূমি যেন মনে হয় পৃথিবীর পটভূমিতে বিস্তৃত। কোনো সীমাবদ্ধতাই এ কাহিনীর নেই। সমস্তটা নিছক বাইরের ঘটনা নয়, কারণ ভাবনা তাতে আদ্যন্ত অন্তর্লীন। কবির নিজের জীবনও এর সংগে যুক্ত। সরকারী দৌত্যবিভাগে চাকরী উপলক্ষে তাঁর মধ্য এশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর *Anabase*-এর রচনা। মনে হয়, গ্রন্থের উল্লিখিত প্রান্তর যেন ব্যক্তি হিসেবে তাঁরই চিত্ত ও অনুভবের প্রান্তর যেখানে ব্যক্তির নিজের সত্তা মুক্তিলাভ করে, তার কালকে ছাড়িয়ে অন্যান্য কালকে খুঁজে পায়। কবির এই একান্ত চেতনা সর্বদা মানুষের পৃথিবীর চলমানতায় স্পন্দিত। এ চলমানতার কথা তাঁরই আশ্চর্য ভাষায় শুনি :

Et la terre en ses graines/ailées, comme un poète en ses propos, voyage . . . .

শেষ পর্বে আবার শুনি :

par dessus les actions des/hommes sur la terre, beaucoup/de signes en voyage, beaucoup/de graines en voyage, et sous/l'azyme du beau temps, dans un/grand souffle de la terre, toute/la plume des moissons! . . . .

কিন্তু এ শ্রেণীর কাব্য জনপ্রিয়তার হাটে বিকোয় না এবং কার্তেজীয় ধারায় বিন্যস্ত নয় ব'লে 'ঐতিহ্য'-প্রেমিক সমালোচকরা তার প্রতি বাম। ইংরেজ কবি এলিয়টের কৃতিত্ব এই যে তিনি এ কাব্যের উৎকর্ষ প্রথম দর্শনেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং ইংরিজী পাঠকের কাছে তাকে উপস্থিত করেছিলেন। *Anabase* তিনি অনুবাদ করেন ৩১ বছর আগে। তখন প্যার্সের প্রতিষ্ঠা নগণ্য, এমনকি ফ্রান্সেও তিনি বিশেষ পরিচিত ন'ন। তার ১৯ বছর বাদে অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। তৃতীয় অর্থাৎ আলোচ্য সংস্করণটি ফেবার এন্ড ফেবার কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তখনও প্যার্স নোবেল পুরস্কার পাননি। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, এ প্রকাশনার পেছনে প্রেরণাটা ব্যবসাবুদ্ধির নয়, সাহিত্যবোধের।

ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ কবি এলিয়টের অনুবাদ যে সব দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হবে তা ধ'রে নেওয়া যায়। তবু তিনি ঝুঁকি নেননি। প্যার্সের বাক্যগঠন, বাক্যের অন্তরালবর্তী ছন্দ এবং শব্দব্যবহার সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, অন্য ভাষায় তার যথাযথ প্রকাশ অসম্ভব। এলিয়ট সেই জন্যে মূলকে অনুবাদের পাশে পাশে রেখেছেন অর্থাৎ মূলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট রেখেছেন। অনুবাদ তিনি যথাসম্ভব মূলানুগ করতে চেয়েছেন। প্রথম সংস্করণে খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তা সম্বরণ করেন এবং তৃতীয় সংস্করণে স্বয়ং কবির অদলবদল মেনে নিয়ে অনুবাদ আরও আক্ষরিক করেছেন। তবু কোনো কোনো জায়গায় অনুবাদ সম্বন্ধে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। সসঙ্কোচে সেটা বলি। সঙ্কোচের কারণ, প্যার্স নিজে অনুবাদ দেখে দিয়েছেন। কোনো অনুবাদকে যখন মূল লেখক অনুমোদন করেন তখন তা একটা প্রামাণ্যতা পায়। যেন, যা হয়েছে সেটাই ঠিক। তবুও কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি।

যে কোনো কবির রচনায় শব্দ প্রয়োগের ভঙ্গী এবং ধ্বনির একটা অনন্য ভূমিকা আছে, প্যার্সের রচনায় তো বিশেষ ক'রে। অনুবাদে কোথাও কোথাও তা অবহেলিত মনে হল। প্রথম অংশে routes nocturnes এবং routes splendides দু'রকমভাবে ভেঙে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে routes কথাটাই অনুবাদে রাখা হয়নি। শব্দটিকে বজায় রেখে দুটি বিশেষণ বা বিশেষণাত্মক বাক্যাংশ ব্যবহার করা কি সম্ভব ছিল না? দুটি পৃথক বিশেষণ দিয়ে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। এ রকম পুনরাবৃত্তি অন্যত্রও বজায় রাখা হয়নি। যেমন, ষষ্ঠ অংশে se vêtaient d'un souffle, ces tissus এবং apaiseront d'un souffle, ces tissus । অনুবাদে দ্বিতীয়টি আক্ষরিক, কিন্তু প্রথমটি নয়। কেন? সপ্তম অংশে Levez un peuple de miroirs অনুবাদে Levy a wilderness of mirrors হওয়ার কারণ বুঝিনি, যখন ওরই অব্যবহিত পরের বাক্যাংশ প্রস্তরের উল্লেখে Levez শব্দটি একাধিকবার Raise-এ

রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবং কেন wilderness? কেন multitude জাতীয় কোনো শব্দ নয়? নবম অংশে félicité শব্দটি এক স্তবকে felicity এবং অন্য স্তবকে bounty ব'লে অনূদিত, অথচ পুনরাবৃত্তি দিয়ে ভাবমণ্ডল রচনা মূলে স্পষ্ট। দু' এক জায়গায় অনুবাদের যাথার্থ্যও প্রশ্নাতীত নয়। যেমন, প্রথম অংশে আছে : et, portant au delà les semences du temps, l'éclat d'un siècle . . . . এর অনুবাদে পাই : and there beyond the seeds of time, the splendour of an age . . . ., কিন্তু ফরাসী থেকে মনে হয় প্রথম ভাগটির মানে অন্যরকম।

যাই হোক, এসব সামান্য প্রশ্ন। কারণ কবিতার অনুবাদকর্ম সহজ সরল ব্যাপার নয়। অনুবাদক মূল কবিতাকে যেভাবে উপলব্ধি করেন, প্রধানত তার দ্বারাই রূপান্তর নির্ণীত হয়। সুতরাং যে কোনো অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কবিতার পাঠকের পক্ষে সর্বত্র সায় না দিতে পারা খুবই সম্ভব। কারণ সেও তার মতো ক'রে কবিতাকে উপলব্ধি করে। *Anabase*-এর বেলায় ইংরিজী পাঠকদের এইটাই সৌভাগ্য যে, টি. এস. এলিয়ট তার অনুবাদে হাত দেন। ফলে মূলের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছে।

এ গ্রন্থে এলিয়ট নিজের মুখবন্ধ ছাড়া অন্য ভাষা থেকেও কিছু আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। জার্মানীর হফমানষ্টাল, ইতালীর উনগারেত্তি এবং ফ্রান্সের ভালেরি লার্‌বো ও লার্সিয়্যাঁ ফার্‌গ্‌ *Anabase* সম্বন্ধে যে ভূমিকা বা পরিচয় লেখেন তার অনুবাদ। এই সব প্রখ্যাত কবি এবং লেখকের রচনা প'ড়ে প্যার্সের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল নিশ্চয়ই বাড়বে।

অরুণ মিত্র

বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ। বাক্ সাহিত্য। মূল্য পাঁচ টাকা।

জন্ম : ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ। ধর্মতলা অ্যাকাডেমী : ১৮১৫-২৩ খৃষ্টাব্দ। হিন্দুকলেজে নিয়োগ : ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কার : ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু : ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ (পূর্ববর্তী ঘটনার আট মাস পরে)।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জীবনপঞ্জী সংক্ষেপে রচনা করা সম্ভব হলেও তাঁর জীবন ছিল কর্মবহুল। সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজসংস্কারক এবং কবি এই চতুর্বিধরূপে তাঁর বাইশ বছরের জীবনে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। বিশেষত হিন্দুকলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ) থেকে তাঁর বহিষ্কার উপলক্ষ্য ক'রে সেই সময় বাংলাদেশে বহু বাদানুবাদ এবং সামাজিক কোলাহলের সূত্রপাত হয়। ডিরোজিওর অনেক বাঙালি শিষ্য ছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁর জীবনসম্পর্কে তথ্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কোনো রচনা তাঁরা রেখে যান নি। এমনকি ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে তাঁরা এমনই নিরুদ্যম ছিলেন যে ১৮৩২ সালে যে স্মৃতিসভায় ডিরোজিওর বন্ধু এবং শিষ্যরা তাঁর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে নশো টাকা চাঁদা তোলেন সেটি কে বা কারা তছরূপ করে ফেলেন। ফলে পার্ক স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্রে ডিরোজিওর সমাধিস্থানটি আজও অচিহ্নিত অবস্থায় পড়ে আছে।

অতএব ডিরোজিওর মৃত্যুর একশো তিরিশ বছর পরে যে জীবনীকার তাঁর জীবনী-

রচনায় হাত দেবেন তাঁর কাজ কঠিন। ১৮৮৪ সালে ইংরিজিতে প্রকাশিত Thomas Edwardsএর একটি জীবনী এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনা ছাড়া তাঁর জীবনীর উপাদান বেশি নেই। হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়ণের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলেও তিনি সেখানে ঠিক কী বিষয় পড়াতেন, দর্শন ছাড়া অন্য বিষয়ের কীরূপ আলোচনা করতেন তার কোনো ধারণা পাওয়া কঠিন। ১৮২৬ সালে হিন্দুকলেজে নিয়োগের পরবর্তী পাঁচ বছর ডিরোজিওর জনপ্রিয়তার আভাস অনেক জায়গায় পাওয়া গেলেও সে সব উল্লেখ থেকে ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই যায়।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের জীবনীতে হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা এবং হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কারকেই ডিরোজিওর জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা হিশেবে দেখানো হয়েছে। মনে হয় সেই ঘটনার স্বরূপ বিচার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এবং এই বিচারে হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালীর পর্যালোচনা যতটা প্রাসঙ্গিক, তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ততটাই বিবেচনার যোগ্য। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত ঘোষের গ্রন্থে পরের দুটি বিষয়ে আলোচনা হয় অপূর্ণাঙ্গ, নয়তো পক্ষপাতদুষ্ট।

১৮২৬ সালে এখনকার মতো বিদ্যার বিভাগ ঘটেনি; একই শিক্ষক একাধিক বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। যেমন ডিরোজিও দর্শন ইতিহাস সাহিত্য ত্রিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষা এবং সমাজসংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রেরণাদানের মধ্যে কোনো একটা পার্থক্য সম্ভবত আছে। চিন্তাসংস্কারক শিক্ষক এবং সমাজনেতা উভয়েই হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পদ্ধতি ভিন্ন, এবং তার ফলও, অন্তত প্রত্যক্ষ ফল, ভিন্ন। এই পার্থক্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকের অবহিত হওয়া কর্তব্য, বিশেষত তাঁর ছাত্ররা যদি সদ্যোযুবা হন। (ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স, ১৮৩১ সালে, ডিরোজিওর হিন্দুকলেজ ত্যাগের অব্যবহিত পরে, ১৮ বছর; দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বয়স ১৭ বছর।) ডিরোজিও ক্লাশঘরে কী পড়াতেন তার আভাস আমরা পাই, কিন্তু তাঁর পাঠ্যক্রম, বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু এবং ইতিহাস ও সাহিত্যসম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কোনো খবর পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার ফল ছাত্রদের ওপর কী ফলেছিল সেটা বিচার করা দরকার।

নব্যযুবকদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির চর্চা এবং উৎকর্ষতা নিশ্চয়ই ডিরোজিওর শিক্ষার প্রধান সুফল। কিন্তু চিন্তাশক্তির উন্মেষে সাহায্য করার সময় গুরুর কর্তব্য সংযমের শিক্ষা ছাত্রদের দেয়া, বিশেষত যখন শিক্ষক ও শিষ্য সমাজের প্রচলিত সংস্কারাদি পর্যালোচনা করতে উদ্যত। বিদ্রোহের চিন্তা তরুণদের কাছে আকর্ষণীয়, এবং সেই জন্যই গুরুর কর্তব্য সমাজের বিবর্তনে প্রথা এবং পরিবর্তনের সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে বলা। মনে হয় ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং ইংরিজি রচনায় এই সংযম এবং সুচিন্তার অভাব ছিল। ডিরোজিওর সুযোগ্য ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুবর্গ যে কাজ করেছিলেন তাকে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল না বললেও তার দায়িত্ব থেকে ডিরোজিওকে মুক্তি দেয়া যায় না। আমি শ্রীযুক্ত ঘোষের বই থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করছি :

> কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্যকলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁর বাড়ির উত্তরে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ২৩ আগস্ট ১৮৩১। কৃষ্ণমোহন কোন কাজে সেদিন বাইরে

> বেরিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে এসে বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গরম গরম কথাবার্তা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। সেই উত্তেজনার বশে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি ও গোমাংস নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা তাতেই শেষ হয় না। ভক্ষণান্তে গোমাংসের হাড়গুলি উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করা হয়। গো-হাড় গো-হাড় ধ্বনি শুনে চক্রবর্তীরা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেদের কীর্তি দেখে স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বালখিল্যদের এই ঔদ্ধত্য তাঁদের অসহ্য মনে হয়। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের প্রহার করতে উদ্যত হন। অজস্র ধারায় অশ্রাব্য কটূবাক্য ও অভিসম্পাত তরুণদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। প্রহারের ভয়ে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দৌড় দেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ ডিরোজিওর রচনার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছেন। একথা বলতে পারলে আমি খুশি হতুম যে এইসব রচনায় শিক্ষকসুলভ বিচক্ষণতা এবং স্থৈর্যের পরিচয় আছে। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষরা ছাত্রদের সভাসমিতিতে যোগদান করা নিষেধ করে যে আদেশ জারি করেছিলেন তার প্রতিবাদে *India Gazette* যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন অনেকে মনে করেন (শ্রীযুক্ত ঘোষও করেন) তার রচয়িতা ডিরোজিও। সেই রচনার কিছু অংশ :

> We regret much to see the names of such men as David Hare and Rassomoy Dutt attached to a document which presents an example of presumptuous, tyrannical and absurd intermeddling with the right of private judgment on political and religious questions. The interference is presumptuous for the Managers as Managers have no right to right whatever to dictate to the students of the Institution, how they shall dispose of their time outside College. It is tyrannical for although they have not the right, they have the power, if they will bear the consequences to inflict their serious displeasure on the disobedient. It is absurd and ridiculous, for if the students knew their rights and had the spirit to claim them, the Managers would not venture to enforce their own order, and it would fall to the ground an abortion of intolerance.

এই সঙ্গে ডিরোজিওর ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরিজি রচনা তুলনা করলে শিক্ষক ও শিষ্যের এক বিষয়ে মিল সহজেই চোখে পড়বে :

> The rage of persecution is still vehement. The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the

*Gurum Shabha** is violent, and they know not what they are doing. Ex-communication is the cry of the fanatic. We hope perseverence will be the liberal's answer. The *Gurum Shabha* is high; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage; let them burst forth into a flame. Let the liberal's voice be like that of the Roman, a Roman knows not only to act but to suffer. Blown be the trumpet of excommunication from house to house. Be same hundreds cast out of society; they will form a party, an object devoutly to be wished by us.

—*The Enquirer, July 1831*

বস্তুত শ্রীযুক্ত ঘোষের রচিত "বিদ্রোহী ডিরোজিও" পড়ে যে কথাটা আমার বহুবার মনে হয়েছে তা হল এই যে হিন্দুকলেজের এই শিক্ষকটির চরিত্রে সংযমের বিশেষ অভাব ছিল। যিনি খবরের কাগজের আপিশ থেকে ক্লাসঘরে যান এবং ক্লাসঘর থেকে সেই আপিশে ফেরেন তাঁর পক্ষে ক্লাসঘরে কতটা মিতভাষণ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দেয়া সম্ভব জানি না। তবে মনে হয় সংবাদপত্রের সহসম্পাদক এবং শিক্ষক একই ব্যক্তি হলে তিনি শিক্ষকতা এবং সমাজসংস্কারের প্রেরণাদানের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হবেন না। কথাটা একটু নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু আজ যদি ডিরোজিওর ১৮২৬-৩০ সালের বক্তৃতামালার ফল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করত তাহলে হিন্দু অহিন্দু যে কোনো কলেজ থেকেই তাঁর পদচ্যুতি ঘটত।

বিনয়বাবুর বইটি পড়ে মনে হয় তাঁর আলোচ্য চরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাস এবং অসংযম তাঁকে কিছুটা সংক্রামিত করেছে, এবং তিনিও তাঁর আদর্শপুরুষের মতো শিক্ষক এবং চিন্তানায়কের যথাযথ কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত নন। তাঁর রচনা পড়ে মনে হতে পারে যে সমাজ এবং ঘটনাপ্রবাহ দুষ্টনিয়তির মতো এই প্রতিভাবান যুবকটিকে তাড়না করেছে, এবং তার জন্য পরবর্তীকালের সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য অবিসংবাদিত পূজা। স্বাধীন চিন্তা এবং প্রচলিত সংস্কারের ইতিহাসে ডিরোজিওর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সেই ভূমিকায় ডিরোজিওর হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কার ক্ষুদ্র একটি অনুচ্ছেদমাত্র। লোকশিক্ষা এবং চিন্তাসংস্কারের অনেকগুলি পথ আছে, কোনো সাংবাদিক যদি সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য পথগুলিও ব্যবহার করতে চান তাহলে সেগুলি থেকে তিনি বিতাড়িত হতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে সেটা দুঃখের হতে পারে, কিন্তু অবিচার তাতে কিছু আছে বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষের জীবনী রচনার এবং শিক্ষা সম্পর্কে মনোভঙ্গী সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। "বিদ্রোহী ডিরোজিও"-র উৎসর্গপত্রে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের (শ্রীযুক্ত ঘোষের শিক্ষক) নামের ওপরে, আশা করি তাঁকে উদ্দেশ্য করে নয়, আনাতোল ফ্রাঁসের যে রচনাটি তিনি নিক্ষেপ করেছেন সেটি মারাত্মক :

Let our teaching be full of ideas. Hitherto it has been stuffed

* গুড়ুম সভা

only with facts.

শিক্ষকরা যদি তথ্য বাদ দিয়ে শুধু ধারণাই প্রচার করতে পারতেন তাহলে তাঁদের কাজ খুব সুখের হত সন্দেহ নেই, এবং ধারণা বা মতবাদ প্রচারের গরিমায় শুধুমাত্র পেট ভাতায় এই কাজ করতে কিছু উৎসাহী ব্যক্তি সানন্দে রাজি হতেন। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষকতায় এতটা 'গ্ল্যামার' অধিকাংশ শিক্ষকই খুঁজে পাবেন না। ডিরোজিওর ছাত্রদের মতো এখনকার কলেজের ছাত্ররাও প্রায়যুবা অথবা সদ্যোযুবা। তথ্যের ভিত্তি পরিশ্রমসহকারে সুদৃঢ় না করে মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার ফল তাদের ওপর মারাত্মক হতে পারে। স্বয়ং ডিরোজিও-ও মুখে তথ্যপ্রধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। উইলসন সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ডিরোজিও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে দর্শন অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের তিনি উভয়পক্ষের যুক্তি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন, মতপ্রচারের চেষ্টা করেননি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রাঁসের উক্তিটি শিক্ষাসম্পর্কে রোমাণ্টিক ধারণার পরিচায়ক। অশিক্ষকরা প্রায়ই শিক্ষাপদ্ধতি-সম্পর্কে শিক্ষকদের জ্ঞানদান করতে ভালোবাসেন; সেরকম জ্ঞানের একটি ইস্কুল খুললে তার দরজায় ফ্রাঁসের উক্তিটি লিখে রাখা যেতে পারে; একটি শিক্ষকের জীবনীর উৎসর্গপত্রে, অন্য এক শিক্ষকের নামের ওপরে এধরনের উক্তি হাস্যকর।

বস্তুত শিক্ষার প্রণালী এবং শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে এরকম ধারণা বিনয়বাবুর জীবনীরচনাকে এতদূর প্রভাবিত করেছে যে আলোচ্য গ্রন্থটিতে শিক্ষকের জীবনকে রঙ্গমঞ্চের নাটকের সঙ্গে তিনি পুনঃ পুনঃ তুলনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম সংগ্রাম, ঝড়, উল্কাপাত; জীবননাট্যের অকস্মাৎ যবনিকা, ঘটনাচক্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক নায়ক, একাংকজীবননাট্যের শেষদৃশ্যের পর্দা ইত্যাদি কথা হামেশাই পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে লেখকের ঘোষিত উদ্দেশ্য জীবনীরচনা হলেও, অবৈধপ্রণয় নাটকের সঙ্গে।

হয়ত এইজন্যই ভাষাব্যবহারে লেখক একাধিকক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। "বিদ্রোহী ডিরোজিও" সম্পর্কে আমি এখনো স্থির করে উঠতে পারিনি যে বইটি কিশোরদের উপযোগী করে লেখা না বয়স্কপাঠ্য। আশা করি কিশোরদের জন্য নয়, কেননা বাংলারচনার যেসব নিদর্শন তারা এতে পাবে তা তাদের পক্ষে বিশেষ শুভ হবে বলে মনে হয় না :

> ১. আজকের বিশশতকের বহুমুখী অগ্রগামী সমাজে প্রবীণ-নবীনের নীতিবিরোধের ফলে উনিশ-শতকী প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি হওয়া বোধ হয় আর সম্ভব নয়। কারণ সতত-সচল সমাজের বুকে আজকে জেগেছে ঝঞ্ঝামদমত্ত বলাকার অস্থিরতা, অনবরুদ্ধ বেগের আবেগ। তার পথচলার মন্ত্র হয়েছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। স্থাবর-জঙ্গমের বৈপরীত্য নব-বিজ্ঞানের যুগে আজ দ্রুতবিলীয়মান। (পৃষ্ঠা ২)
>
> ২. ধর্মতলার স্কুলে ডিরোজিও যখন যুক্তিবাদী গুরু ড্রামণ্ডের কাছ থেকে নব্য যুগাদর্শে দীক্ষাগ্রহণ করছিলেন নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে, বাইরে তখন রামমোহনের সঙ্গে প্রাচীন পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় শস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শোনা যাচ্ছিল। (পৃষ্ঠা ৩৩)
>
> ৩. টাকার জ্বলন্ত চুল্লীতে যদিও তখন সামন্তযুগীয় জাতিকুলগত মর্যাদার মানদণ্ড ক্রমেই ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছিল, তা হলেও প্রাচীন প্রথার প্রতাপ সহজে যাবার নয় বলে নতুন নগরে তা লোপ পায়নি। (পৃষ্ঠা ৩৭)

৪. পাণ্ডিত্যের ভারের চেয়ে ডিরোজিওর প্রতিভার দীপ্তি ছিল বেশি, তাই বিদ্যা যেটুকু তাঁর ছিল তা প্রতিভার মন্ত্রস্পর্শে জ্বলে উঠত চক্‌মকির মতন। ছাত্ররা যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসত তারা কেবল বিদ্যার হিমশীতল পাথুরে চাপ সহ্য করত না, প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গের উত্তাপও অনুভব করত। (পৃষ্ঠা ৪৬)

৫. তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবীণদের চক্রান্তে মনে হয় যেন তরুণ গুরুর আত্মাভিমানের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তাই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি হয়েছে কোনো গোপন বিপ্লবীচক্রের উদ্ভূত ইশ্‌তেহার। (পৃষ্ঠা ৬৬)

৬. দৈত্যাকার মিথ্যার তাণ্ডবনৃত্যের দাপটে একজন তরুণশিক্ষকের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিহাসের পাতায় শুধু এইটুকুই কি লেখা থাকবে? (পৃষ্ঠা ৮৫)

ডিরোজিওর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বিনয়বাবু তাঁর জীবনীতে বিশদ আলোচনা করেছেন; সামাজিক পরিবেশ, কর্মজীবন, ঝড়, উল্কাপাত—শুধু এই পরিচ্ছেদগুলিতেই যে ডিরোজিওর কবিতার উল্লেখ এবং আলোচনা আছে তা নয়, পরিশিষ্ট ১-এ ডিরোজিওর চোদ্দ বছর বয়সে লেখা একটি কবিতা এবং *Calcutta Gazette* পত্রিকায় প্রকাশিত ডিরোজিওর কবিতাবলীর একটি বিস্তারিত সমালোচনাও তুলে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ডিরোজিওর কবিতাবলী সম্পর্কে বিনয়বাবু বলেছেন :

> কাব্যিক মাধুর্য ও উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করলে উচ্চাঙ্গের কবিতা এগুলিকে নিশ্চয় বলা যায় না। ডিরোজিওর অধিকাংশ কবিতাতেই যৌবন-সুলভ ক্ষিপ্রতা ও অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নও তাঁর এত অল্প ছিল যে প্রধানত শিক্ষালব্ধ ভাবধারা থেকেই তাঁকে কাব্যের প্রেরণা ও উপাদান দুইই সংগ্রহ করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির একাত্মতার ফলে কবিতায় যে অনবদ্য লাবণ্য ফুটে ওঠে, তা তাঁর কবিতায় বিশেষ ফুটে ওঠেনি। (পৃষ্ঠা ১২৭)

তাহলে এই প্রশ্ন করা কি অসঙ্গত হবে যে বিনয়বাবুর রচনায় ডিরোজিওর কবি-প্রতিভার আলোচনা ও ব্যাখ্যা এত বেশিবার করা হয়েছে কেন? কবিতাগুলি ইংরিজিতে উদ্ধৃত করে সর্বদা তিনি বাংলা অনুবাদ দিয়ে দিয়েছেন। প্রায়শই কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। না হয় মেনেই নেয়া গেল বাইশ বছর আট মাস বয়সে মৃত এক যুবকের পক্ষে এই কাব্যপ্রতিভার নিদর্শন প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিশিষ্ট ১-এ সব কবিতাগুলি তুলে দিলে পাঠকের প্রতি কিছু বিবেচনা দেখানো হত না? হয়তো তার ফলে বিদ্যালয়ের কবিতা-সংকলনে ডিরোজিওর একটি দুটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধে হত, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনোমোহন ঘোষের কবিতাবলীর জায়গায় ইংরিজি অনার্সে ডিরোজিওর কবিতা পাঠ্য করতে অনুপ্রাণিত হতেন।

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা—শ্রীপান্থ। ত্রিবেনী প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

শ্রীপান্থের অষ্টাদশ শতকের কলকাতার উপর রচনাগুলো যখন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'তে থাকে, তখনই পাঠকমহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি ক'রেছিলো। তারপর পুরোনো কলকাতার উপর তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় "আজব-নগরী" এবং ইতিহাসভিত্তিক সংবাদধর্মী রচনায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

"কলকাতা" তাঁর অধুনাতম সংযোজন। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, 'আমি ঐতিহাসিক নই, সমাজ-বিজ্ঞানীও নই, বরং বলতে পারি—সাংবাদিক। ফলে, এই বই-এর তথ্যগুলো ইতিহাসের হ'লেও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আহৃত।'

এ কথা অনস্বীকার্য যে, লেখকের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে। সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কিন্তু সহৃদয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বিভিন্ন অনেক ঘটনাকে প্রমাণ ভঙ্গীতে তিনি পরিবেশন করেছেন, যাতে পাঠক বিংশ শতকের কলকাতাতেও তার রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। 'বেকার জিন্দাবাদ' প্রবন্ধে ইঙ্গবেকারদের কথা বিবৃত করতে গিয়ে তিনি বর্তমান বেকারদের উল্লেখ ক'রে বলেন, 'ভেবে দেখুন বেকার বাদ দিলে কলকাতার মানে দাঁড়ায়—ডালহৌসির খানকয়েক কেরানীশালা আর বড়বাজারের গুটিকয় গুদাম। এ শহর হাড্ডিসার হ'য়ে যায়। ইঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কর্মহীন ছেলেগুলিই জন্ম থেকে এ শহরের মাংস মজ্জা। তারাই কলকাতার রঙ, কলকাতার জীবন। রোয়াকে রোয়াকে পাতাবাহার সেজে তারাই এ শহরকে সাজায়, গল্প কবিতা লিখে তারাই মজায় এ শহরকে।..... .....তারা আছে বলেই বাঁদর নাচে ভীড় হয়, গণতন্ত্রের ভোট হয়, বিপ্লবের মিছিল হয়। কলকাতার বারোয়ারী তাদেরই দান, জলসা সাহিত্যসভা তাদেরই কৃতিত্ব।'

উপরোক্ত মন্তব্য শুধু ঐতিহাসিক বা সাংবাদিক নয়, সাহিত্যিক সহৃদয় দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিচয়। 'কালিঘাটের বিয়ে' প্রবন্ধটি তো এ জাতীয় সাহিত্যধর্মীতার একটি চমৎকার নিদর্শন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের সমাপ্তি লক্ষ্যণীয়। ঠিক যেন ছোট গল্পের আঙ্গিকে শেষ করা। তীক্ষ্ণ ও ইঙ্গিতপূর্ণ। বইখানার গোড়ার প্রবন্ধটি থেকেই পাঠকের মনে এমনই আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয় যা একটি সার্থক উপন্যাসের সমতুল্য বললেও অত্যুক্তি হবে মনে করি না। সোডা ও বরফের আবির্ভাবের পেছনে এমন যে মজাদার ইতিহাস রয়েছে, শ্রীপান্থই তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

অবশ্যি একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পুরোনো দিনের কথার এমনিতেই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু শ্রীপান্থ নিছক তারই উপর ভর ক'রে দাঁড়াননি। ইতিহাস ভিত্তিক সংবাদ এখানে রসাল হয়েছে সাহিত্যিক মননশীলতায়। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই উপাদেয় এবং তথ্যবহুল। পাঠকের মনে হয় পুরোনো কলকাতাকে অনেকখানিই যেন জানা চেনা এবং বোঝা হ'য়ে গেছে।

ত্রুটির উল্লেখ ক'রতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বহু প্রবন্ধেই লেখকের যত্নের অভাব পরিস্ফুট। যেন রচনার পেছনে ক্ষিপ্রতার একটা চাপ বর্তমান। ছোটখাটো ত্রুটির মধ্যে 'সংক্ষেপে আমার স্ত্রীর কাহিনী' প্রবন্ধে 'প্রশ্নমালার' নীচে প্রশ্ন রয়েছে মাত্র একটি। এ ছাড়া যেখানে তিনি কলকাতা কোন্ কোন্ মনীষী বা মহাপুরুষদের দ্বারা মহিমান্বিত তার উল্লেখ করেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাম অনুপস্থিত। বোঝা যায় এটা অসাবধানতা,

নইলে অমার্জনীয় হ'তো। এ জাতীয় অসাবধানতাপ্রসূত ভুল এবং সামগ্রিক যত্ন সম্পর্কে লেখককে অবহিত হ'তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জ্যোতির্ময় রায়

কাঞ্চনরঙ্গ—শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। গ্রন্থপীঠ। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র লিখিত "কাঞ্চনরঙ্গে"র কাহিনীটা পুরোনো—এদেশে এবং ওদেশে একাধিক নাটক, গল্প, চিত্রনাট্যে একই ধরনের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। দুর্দশাগ্রস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত নায়ক, আকস্মিক লটারি বা উইল-যোগে অর্থপ্রাপ্তি, কাঞ্চন-তৌলে মানুষের মূল্য পরিবর্তন। এমন কি লটারির ভুল নম্বর-ঘটিত প্রহসনও অভিনীত হতে শুনেছি বি বি সি থেকে। তবু "কাঞ্চনরঙ্গ" ভাল লাগল। বাংলা থিয়েটারে প্রহসন অভিনয় প্রায় উঠেই গিয়েছিল, যদিও উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সবই প্রহসন। আজকাল কোনো কোনো অপেশাদার দলের চেষ্টায় প্রহসন পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে। কিন্তু নূতন প্রহসন লেখা হচ্ছে না বললেই চলে। তাই নাটকটা ভাল লাগল।

একজন উদীয়মান নাট্যকারের সঙ্গে সেদিন আলাপ হচ্ছিল। তিনি কতকগুলি হৃদয়-বিদারক অশ্রু-উদ্রেককারী ট্র্যাজেডির রচয়িতা। তিনি বললেন, প্রহসন বাঙালির ভাল লাগে না, লাগতে পারে না।

বললাম, কেন?

তিনি বললেন, বাঙালির জীবন বিধ্বস্ত, প্রতি পদক্ষেপেই ট্র্যাজেডি, বাগজোলায় গুলিবর্ষণ, কাছাড়ে দাংগা। এমতাবস্থায় হেসে সময় নষ্ট করা কি উচিত?

ঔচিত্যের প্রশ্নটা অবান্তর। কথা হচ্ছিল বাঙালি হাসতে চায় কিনা। হাসা উচিত কিনা, এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু নাট্যকার তখন উদ্দীপ্ত; বললেন, "কাঞ্চনরঙ্গ" ছ্যাবলামি। অশ্লীল।

কারণ?

কারণ কর্তা প্রথম অংকে পায়খানায় যাচ্ছেন তাড়াতাড়ি। এবং সেই ন্যক্কারজনক দৃশ্য দেখে নাট্যকার নাকি ভিরমি খেয়েছিলেন।

এটাই হয়েছে বিপদ। উনিশ শতকের বাঙালি লেখকরা আদর্শ ধরেছিলেন রেনেসাঁসের লেখকদের—শেক্‌স্‌পিয়ারকে। শেক্‌স্‌পিয়ারের কাছে অপাংক্তেয় বা অশ্লীল ব'লে কিছুই ছিল না। আর এ যুগের বাঙালিরা মডেল ধরেছেন ভিক্টোরিয়ান শ্লীলতাবাদীদের, যাঁদের নায়করা চাপা ইজের আর আঁটসাঁট কোর্তা প'রে সুসজ্জিত বৈঠকখানা আলোকিত ক'রে মাদাম লীভেন্‌-এর কীর্তিকলাপ আলোচনা করতেন। বার্নার্ড শ'র এলাইজা 'নট্‌ ব্লাডি লাইক্‌লি' উচ্চারণ ক'রে ফেলেছিল ব'লে যাঁরা শিউরে উঠেছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী নয়া বাংলার উদীয়মানরা। এ'দের দৃষ্টিও তাই বৈঠকখানাতেই আবদ্ধ। তার বাইরের কিছু কথা বা আচরণ দেখেই এ'রা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্রকেও এ ধরনের সমালোচনা শুনতে হবে এ আর আশ্চর্য কি?

"কাঞ্চনরঙ্গে" বর্ণিত পরিবারকে যে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতীক ব'লে ধরে

নিতে একটুও বাধবে না। আমাদের মা-বাবা-ভাইরাই এর নায়ক, প্রতিনায়ক। বিশেষ ক'রে ঐ কর্তাটিকে আমার বাবা ব'লে ভুল করার এত অবকাশ থাকে যে বুঝতে পারি কেন ঐ উদীয়মান ট্র্যাজেডি-লেখক সইতে পারছেন না ব্যাপারটা। গায়ে লাগছে। নিরুত্তাপ চিত্তে অন্যের দুর্দশা সম্বন্ধে হাসির নাটক পড়া হয়ে উঠছে না। নিজেই জড়িয়ে পড়ছি নাটকে। পাঁচুকে আমরাই তো পায়ের তলায় দলেছি কতবার, আর তরলাকে করেছি অপমান। সমর-সীমা-অমররাও তো আমাদেরই ঘরের লোক। সমবেত চেতনায় যে পাপের স্মৃতি থাকে তাকেই জাগিয়ে তুলছেন নাট্যকারদ্বয়। সোনা দিয়ে মানুষ মেপেছি আমরা, আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছে চেষ্টারটনের ওগিল্‌ভি পরিবারের সমষ্টি। সেই যে,

As green sap to the simmer trees
Is red gold to the Ogilvies.

আমাদের—ওগিল্‌ভি-দের—পাপের নির্ঘণ্ট, কাঞ্চনরঙ্গ। তাই গায়ে লাগে।

সূত্রধার ও নটীর উপাখ্যানটি চমৎকার হয়েছে।

উৎপল দত্ত

রূপ হোল অভিশাপ—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

বাংলা সাহিত্যে দুই উপন্যাসিক দুই বিভূতিভূষণ। "পথের পাঁচালী"র বিভূতিভূষণ বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের যে চিত্র এ'কেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। আর "বরযাত্রী"র বিভূতিভূষণ বাংলা রস-সাহিত্যকে উচ্চ সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নির্মল হাস্যরসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র আবিষ্কারে এই বিভূতিভূষণের তুলনা মেলা ভার। তাঁর "রাণুর প্রথম ভাগ", "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ" "রাণুর কথামালা" গণশা, ঘোৎনা, পুটুরাণী এক একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর ছোট গল্পগুলি হীরকখণ্ডের মত নির্মল ও দ্যুতিময়। আবার বিশুদ্ধ হাস্যরসাশ্রিত উপন্যাস "কাঞ্চন মূল্য" তাঁর আর এক সৃষ্টি। পল্লীবাংলার বিগত দিনের কাহিনী এতে যেমন ভাবে বিধৃত হয়েছে তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তিনি তার গল্পের নায়ক-নায়িকার সন্ধান পেয়েছেন। "কাঞ্চনমূল্যের" বৃদ্ধ স্বরূপ মণ্ডল তাঁর যে দরদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, সেই দৃষ্টিতেই অগুণতি চরিত্রের মুখোমুখি হই তাঁর "দুয়ার থেকে অদূরে" "কুশীপ্রাঙ্গনের চিঠি" প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বল্পসময়ের জন্য তারা আসে কিন্তু তাদের জীবনের সারল্যে, গভীরতায় ও তীক্ষ্ণতায় আমাদের শ্রদ্ধা অধিকার করে।

"রূপ হোল অভিশাপ" উপন্যাসখানির প্রধান চরিত্রগুলিও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। শোভা রায়বাবুদের বাড়ি যে সৌরভী ঝি কাজ করত তার কন্যা কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। তাকে নিয়েই, অর্থাৎ তার অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়েই যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে—এই গল্প। এই কাহিনীর অনেকটা অংশ জুড়ে আছে বসন্ত-ঝি। এমন চক্রান্তকারী কুৎসিত নারীচরিত্র অতি অল্পই দেখা যায়। বিষকুম্ভ পয়োমুখ এই বসন্ত ঝি-র চরিত্র লেখক অতি নির্মমভাবে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই তুলনায় অমৃতঠাকুরাণী

যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেন নি।

বর্তমান বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অন্যতম এবং স্বভাবতই তিনি প্রাচীনপন্থী। চটকদার কথার ফুলঝুরি ছড়ানো অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর তাঁর রচনায় নেই। তিনি চিন্তায় শুচি, বচনে শুচি এবং চিরায়ত আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর রচনা তাই আধুনিক হলেও ক্লাসিক পদ্ধতির, তিনি নিজেও প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান। তাই বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি সত্যকে ধ্রুবতারা করে এগিয়ে গিয়েছেন। বর্তমান উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রটি তাই চরম ট্রাজেডির মধ্যে পরিণতি খুঁজে পেয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে এই পরিণতি হয়ত সহজে মেনে নিতে চাইবে না; তারা নায়িকার উদ্ধারের অনেক রকম পথ বাংলাবে, নায়ককেও বৃথা নিখোঁজ হতে দেবে না—বিশেষ করে নায়ক হাবুল ও তার বন্ধু সতু উভয়েই যখন বসন্ত-ঝির কারসাজি বুঝতে পেরেছিল তখন দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। হলে গল্প অন্য খাতে বইত, রূপ অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারত।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃত হয়েছে, বিষয়-বৈচিত্র্যও নিত্যসম্প্রসার্যমান, প্রকাশ শৈলির প্রাখর্য্যও শানিত হয়েছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অনুভবের গভীরতা বাড়েনি। দেশ-বিদেশের চিন্তায় পুষ্ট, বিশেষ করে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেও অনেক উপন্যাস লিখিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, সুখ ও দুঃখও তো উপেক্ষনীয় নয়, বরং তার মধ্যেই মানুষ আপনার অন্তরের চিরন্তন প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। তাই যখন আমাদের সমাজে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও ধনবণ্টনের সমতার সমস্যা নিয়ে অনেক প্রশ্নের ঝড় বইছে তার মধ্যেও একটি সুন্দরী অসহায় মেয়ের দুর্ভাগ্যের দিকে দরদের দৃষ্টি দিতে প্রবীণ লেখকের মন উৎসুক হয়েছে এবং প্রবীণ বলেই তিনি সে কাহিনী রসোত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অল্প অভিজ্ঞের হাতে এ কাহিনী নিরয়গামী হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিভূতিভূষণ উপন্যাসের একেবারে শেষের কয়েকটি কথায় কাহিনীটিকে ঊর্দ্ধগামী করে দিয়েছেন। ঘটনার এমনভাবে মোড় ঘুরতে অনেক গল্পেই দেখা যায় কিন্তু ভাবের এই ঊর্ধ্বগতি লেখকের রুচির শুচিতা এবং চিরায়ত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই প্রমাণ করে।

সন্তোষকুমার দে

মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বস্ত্র
এই বস্ত্রের জন্য সে তার সমস্ত প্রয়োজন বিসর্জন দিতে পারে
কিন্তু
তার প্রকৃত বিচার নির্ভর করে ভালো কাপড়ের নির্বাচনে

★

উৎকৃষ্ট কাপড়
কিনতে হলে
(কিনবার সময়)
নিউ গুজরাট কটন মিল-এর
কাপড়-ই চাইবেন।

★

নিউ গুজরাট কটন মিলস্ লিমিটেড
৯, ব্র্যাবর্ন রোড, কলিকাতা, ১
ফোন : ২২-২২৬৩, ৬৪, ৬৫

ম্যানেজিং এজেন্টস্:
কানোরিয়া কোম্পানী লিমিটেড
৯, ব্র্যাবর্ন রোড, কলিকাতা, ১